



প্রাচীন সভ্যতা





অমলেশ চন্দ্র মজুমদার

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI, Vide Notification T. B. No. VI/H/79/87 Dated 5. 12. 79

প্রাচীন সভ্যতা

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

অমলেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ, বি. টি.
প্রধান শিক্ষক, নালিকুল দেশবন্ধু বাণী মন্দির,
নালিকুল, হুগলী।

ভারতী প্রকাশনী

৪, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীরণজিৎ বসু
ভারতী প্রকাশনী
8, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মূল্য : চার টাকা মাত্র।

[ভারত সরকার প্রদত্ত সুলভ মূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

প্রথম মুদ্রণ—মে, ১৯৭৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ—ডিসেম্বর, ১৯৭৯

মুদ্রাকর :
শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য
ব্লক এ্যাণ্ড প্রিন্টিং কনসার্ন
৫৯এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

প্রাচীন সভ্যতা

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস পাঠের সার্থকতা

ছোটরা সবাই গল্প ভালবাসে। ইতিহাসও এক অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার। ইতিহাসের গল্পে কিন্তু রূপকথার মত কল্পনার রং মেশান থাকে না। আবার ভূত প্রেত দৈত্যদানোর মত এগুলি আজগুবিও নয়। মানুষের অতীতের কথা আর কাহিনী নিয়েই ইতিহাস।

কয়েক লক্ষ বছর আগে প্রায় আমাদেরই মত দেখতে মানুষ পৃথিবীতে জীবন যাত্রা শুরু করেছিল। প্রথম প্রথম তারা বহুদিন ধরে বনে জঙ্গলে, গাছের ডালে কিংবা পাহাড়ের গুহায় বাস করত। তারা গাছ-পাথর ছুঁড়ে বন্য জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করত। তারা কাঁচা মাংস খেত। সেই মানুষই ধীরে ধীরে আগুন জ্বালাতে শিখল, চাষবাস শুরু করল, নানা রকমের হাতের কাজ শিখল, গ্রাম-নগরীর পত্তন করল। তারা ভাষা শিখল, বিচিত্র সব হরফে লিখতে শুরু করল। এইভাবে পৃথিবীতে সভ্যতার শুরু হল।

ক্রমে পৃথিবীর অনেক জায়গায় সভ্যতা গড়ে উঠল। কোথাও বা আগে, আবার কোথাও বা অনেক পরে। সব সভ্যতার কাছ থেকেই মানুষ কোন না কোন নতুন জিনিস পেয়েছে। সেইজন্য এর কোনটিকেই আমরা বড় বা ছোট বলে মনে করতে পারি না। আর পারি না বলেই সব সভ্যতার কথা ও কাহিনীই আমাদের জানতে হবে।

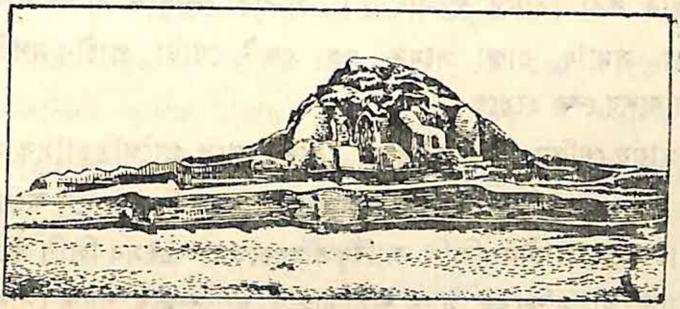
ইতিহাস তো কেবল রাজ-রাজড়াদের কাহিনী; কিংবা যুদ্ধ বিগ্রহের কথা নয়। সব মানুষের কথাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। যারা যুগ যুগ ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলিয়েছে, হাতের কাজ করেছে, নৌকো জাহাজ চালিয়েছে, বিরাট বিরাট সব ইমারত তৈরি করেছে—ইতিহাসে তাদের সবারই স্থান রয়েছে। তাদের সকলের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, উত্থান-পতন সবই রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

আজ মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে কত উন্নত। কিন্তু এই উন্নতি তো হঠাৎ হয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে নানা অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ আজ এত উন্নত হয়েছে। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে বর্তমানের ভিত্তি অতীত। আর ঐ সুদূর অতীতের পথ ধরেই বর্তমানকে জানতে হয়। এইজন্যই আমরা ইতিহাস পড়ি। এখানেই ইতিহাস পাঠের সার্থকতা।

প্রাচীন মানুষের সন্ধান

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ গ্রাম নগরীর পত্তন করেছে। নানা হরফে লিখতে শিখেছে, সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। তারও পরে ইতিহাস লিখতে শুরু করেছে মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল কয়েক লক্ষ বছর আগে। সেই আদিম মানুষদের কথা তো আর কেউ লিখে রেখে যায়নি। তাদের চেহারা কেমন ছিল, তাদের জীবন যাত্রা কেমন ছিল—এইসব কথা আমরা কেমন করে জানব? আর সেই প্রাচীন-কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রকৃতির বুকেও কত পরিবর্তন ঘটেছে। কত নদ-নদীর গতিপথ বদলে গেছে, কত শস্য শ্যামল দেশ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। আবার জলের বুকে জেগেছে কত নতুন নতুন জনপদ। এ ছাড়াও বন্যা, ভূমিকম্প, যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে মানুষের প্রাচীন কীর্তিকলাপ এবং সভ্যতার অনেক চিহ্ন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস লেখার পথে তাই কত বাধা। তবু কিন্তু মানুষ নিশ্চেষ্ট থাকেনি। নানাভাবে অতীতের ধ্বংসস্তূপ থেকে তারা সেই আদিম মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার সন্ধান পেয়েছে। যে সব ধ্বংসস্তূপের কথা বলা হল তার মধ্য থেকেই আদিম মানুষ ও প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ কাজ সম্ভব হয়েছে খননকার্যের ফলে। পণ্ডিত আর বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই খননকার্য চলেছে। আর এই খোঁড়াখুড়ির ব্যাপারেও নানান শিক্ষা, কৌশল ও দক্ষতার প্রয়োজন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক এইসব কাজ ঠিকমত করতে পারেন, তাঁদের বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক। এঁরা শুধু সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে জিনিসই খোঁজ করেন



অতীতের ধ্বংসস্তূপ

না, তাঁরা অতীতের জীবন্ত মানব সভ্যতার নিদর্শনগুলিও খুঁজে বের করেন। এইসব ধ্বংসস্তূপে আদিম মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায়। তাছাড়া পাওয়া যায় পাথর বা ধাতুর হাতিয়ার, ঘটের টুকরো, বাসস্থানের চিহ্ন—এইরকম অনেক কিছু। এইসব টুকরো টুকরো চিহ্ন থেকেই তাঁরা আদিম মানুষের ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে ভাগ করেছেন। এই যুগগুলি হল পুরা প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ এবং লৌহ যুগ।

এবার প্রশ্ন জাগবে এই যুগগুলি কোনটির পর কোনটি এল? এটিও কিন্তু খননকার্যের ফলে জানা গেছে। মাটির নীচের স্তরের

প্রত্নবস্তু উপরের স্তরের প্রত্নবস্তু থেকে প্রাচীন এ কথা বলা চলে। প্রত্নবস্তু স্তর হিসাবে সাজিয়ে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে তা নির্ধারণ করা যায়। মাটির সব থেকে নীচু স্তরে পাওয়া গেছে এবরো-খেবরো খসখসে পাথরের হাতিয়ার, তার ওপরের স্তরে দেখা গেছে ঝক্‌ঝকে মসৃণ পাথরের হাতিয়ার, তার ওপরের স্তরে পাওয়া গেছেধাতুর তৈরী হাতিয়ার বা ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্র। এই কারণেই ক্রমান্বয়ে যুগগুলির নাম দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক স্থানে এই খননের কাজ চলেছে। এর ফলে নানা স্থানে নানা ধরনের জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোথাও পাওয়া গেছে মাটির পাত্র এবং তার গায়ে নানা রঙের নক্সা, মানুষের ব্যবহার করা বিচিত্র গয়নাগাঁটি। আবার কোথাও বা ঘর বাড়ী, মন্দির, সমাধি, রাস্তা সমেত এক একটি গোটা প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বের হয়েছে।

মানুষ যেদিন লিখতে শিখল সেদিন থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ শেষ হল এবং ঐতিহাসিক যুগ শুরু হল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে অজানা ভাষার বহু প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব লিপি স্তম্ভে, পাহাড়ে বা মন্দিরের গায়ে শীলমোহরে বা তামার পাতে খোদাই করা হত। এইসব লিপিকে বলা হয় খোদিতলিপি। তাছাড়া সেই সুদূর অতীতে তো আর এখনকার মত কাগজ আর ছাপাখানা ছিল না। সেইজন্য তখনকার মানুষ তালপাতা, চামড়া বা মাটির ওপর লিখত। গোঁজের মত মাটির টালির ওপর লেখা রোদে বা আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হত। আবার কোথাও একপ্রকার জলজউদ্ভিদ্‌ চিরে সেগুলি জুড়ে কাগজের মত করে নিয়ে তার ওপরে লেখা হত।

কিন্তু তখনকার মানুষের ভাষা বা লিপি তো আজকের মত ছিল না। তাই অনেকদিন পর্যন্ত সেগুলি পড়তে বা বুঝতে পারা যায়নি। কিন্তু পণ্ডিতেরা বহুদিন ধরে চেষ্টা করে সেই খোদিত-লিপি বা পুঁথির লেখার বেশীর ভাগই পাঠোদ্ধার করেছেন। এর ফলে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের একটা মোটামুটি কাঠামো তৈরি হয়েছে।

এ ছাড়া, প্রাচীন মুদ্রার সাহায্যেও ইতিহাসের বহু তথ্য জানা গিয়েছে। রাজাদের মুদ্রায় তাঁদের নাম লেখা থাকত। কোন কোন মুদ্রায় আবার সাল প্রভৃতি লেখা থাকত। যে সমস্ত অঞ্চলে একই ধরনের মুদ্রা পাওয়া গেছে, সেগুলি দেখে সেই মুদ্রায় অঙ্কিত রাজার রাজ্যের সীমানা ঠিক করা হয়।



ইতিহাসের উপাদান—প্রাচীন মুদ্রা

আদিম মানুষকেও প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস রচনা করতে তাই কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। শত শত পণ্ডিত, আবিষ্কারক ও গবেষকের প্রচেষ্টাতেই মূক অতীত আজ কেমন মুখর হয়ে উঠেছে!

অনুশীলনী

ক) গল্প আর ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য কি? ইতিহাসের পাতায় পাতায় কোন্ কোন্ জিনিসের খোঁজ পাওয়া যায়? অতীত দিনের ইতিহাস পড়ার সার্থকতা কি?

খ) প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস লেখার পথে বাধা কোনগুলি? কিভাবে আদিম মানুষ ও প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া সম্ভব হয়েছে? আদিম মানুষের ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে এবং ভাগগুলির নাম কি?

গ) প্রত্নতাত্ত্বিক কাদের বলা হয়? ইতিহাস রচনায় তাঁরা কিভাবে সাহায্য করেন?

ঘ) খোদিতলিপি কাকে বলা হয়। প্রাচীন যুগে এগুলি কোথায় এবং কিভাবে খোদিত করা হত? প্রাচীন লিপি কি ভাবে লেখা হত?

ঙ) প্রাচীন মুদ্রা ইতিহাস রচনায় কিভাবে সাহায্য করে?

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম মানুষ

আজ থেকে বিশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ বাস করত। তাদের দেখতে ছিল আধা বন-মানুষ আর আধা মানুষের মত। তিন লক্ষ বছর আগে কিন্তু অনেকটা আমোদের মত দেখতে মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। চীনের রাজধানী পিকিংয়ের কাছে চৌকিতিয়েন নামে একটি পাহাড়ের গুহায় এই ধরনের মানুষ এবং অনেকগুলি জন্তু-জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এই যুগের মানুষদের নাম দেওয়া হয়েছে পিকিং মানুষ।

পিকিং মানুষদের দেখতে পুরোপুরি আমাদের মত ছিল না। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের দেহের গড়ন এবং মুখের আদলের অনেক পরিবর্তন ঘটল। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আমাদের মত দেখতে বুদ্ধিমান মানুষ পৃথিবীর অনেক জায়গায় বসবাস করছিল।

পিকিং মানুষেরা নানা রকমের ছোট বড় জন্তু-জানোয়ার শিকার করত। হাতী, গণ্ডার, বাইসন প্রভৃতি বড় বড় জানোয়ার শিকার করা তো একজনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর শিকার না করলে তারা খাবেই বা কি? সেইজন্য তারা দল বেঁধে পাথর ছুঁড়ে এবং ফাঁদে ফেলে সেইসব জন্তু-জানোয়ারদের হত্যা করত। এই পিকিং মানুষেরা কিন্তু কাঁচা মাংস খেত না। তারা পাথর দিয়ে একরকম চাঁছুনী তৈরি করে শিকার করা পশুর ছাল ছাড়িয়ে মাংস ঝলসে বা পুড়িয়ে নিতে খেত। ঐ পাহাড়ের গুহায় ছাইয়ের গাদা থেকে ধারণা করা হয়েছে যে তারা আগুনের ব্যবহার জানত। আগুন ব্যবহার করার কৌশল আয়ত্ত করা হল আদিম মানুষের একটি বড় আবিষ্কার।

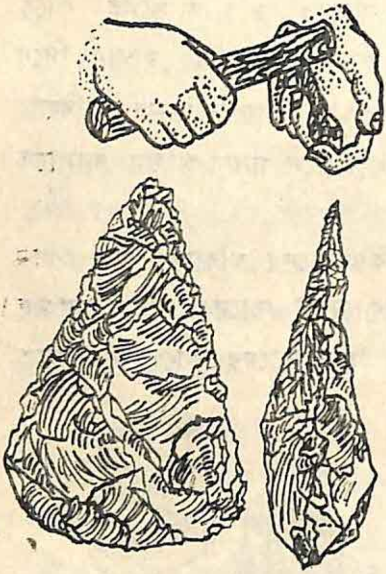
এই আগুনের ব্যবহার শিখতে সেইসব আদিম মানুষদের অনেক দিন লেগেছিল। গুহার মধ্যে প্রচণ্ড শীতে তারা ঠক ঠক করে কাঁপত। বন্য জন্তুর ছাল চামড়ার পোশাকে তাদের শীত কমত না। এবার কিন্তু গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে ঠাণ্ডা থেকে তারা শরীর গরম রাখতে পারত। জন্তু-জানোয়ারেরা ভয়ে আগুনের কাছে ঘেঁসতে পারত না। তারপর কাঠের সঙ্গে কাঠের জোগান দিয়ে তারা সেই আগুনকে রক্ষা করতে শিখল। তারপর মানুষ আবিষ্কার করল চকমকি পাথর। পাথরে পাথরে ঘসে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল।

কয়েক লক্ষ বছর ধরে মানুষ কিন্তু তাদের খাবারের জন্য কোন ফসল ফলাতে শেখেনি। পশুপক্ষীর মতই তাদের খাবার সংগ্রহ করতে হত। খেয়ে বেঁচে থাকাই ছিল তাদের কাছে সব থেকে কঠিন সমস্যা। এর জন্য তাদের ব্যস্ত থাকতে হত সারাদিন। পশুর মাংসই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। তার সাথে থাকত চাক-ভাঙ্গা মধু, বনের ফল, মাটি খুঁড়ে বের করা বুনো বাদাম, ওল বা কচুর মত কন্দ। জলার ধারে যারা থাকত তারা মাছ শিকার করত। এক জায়গায় খোরাক ফুরিয়ে গেলে তারা খাদ্যের সন্ধানে অন্য জায়গায় যেত।


পুরা প্রস্তর যুগের অ-মসৃণ হাতিয়ার

পুরা প্রস্তর যুগ :—আদিম মানুষ প্রথমে গাছ পাথর ছুঁড়ে বা ফাঁদে ফেলে জন্তু-জানোয়ার শিকার করত। কিন্তু শিকার করলেই তো হল না। মাংস কাটবার জন্য, ছাল ছাড়াবার জন্য হাতিয়ার চাই, জল রাখবার জন্য পাত্র চাই। এইসব প্রয়োজনের তাগিদেই তারা পাথর ঘসে ঘসে হাতিয়ার তৈরি করতে শিখল। এগুলি ছিল

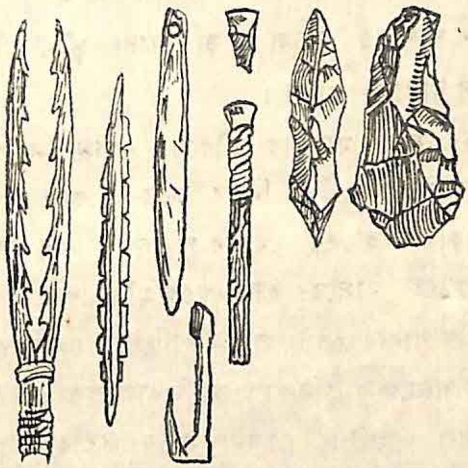
অ-মসৃণ হাতিয়ার। মানুষের তৈরী হাতিয়ারের এগুলি প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রথমে তারা মাপমত দুটো পাথরের নুড়ি দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘসে ঘসে কিংবা ঠুকে ঠুকে কিছু কিছু জিনিসপত্র তৈরি করত। বেশ কিছুদিন তারা ঐ পাথর দিয়েই এক ধরনের হাত-কুড়ুল তৈরি করতে শিখল। পরে একটা পাথরের ফলককে পাথরের বা কাঠের তৈরী হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে কোণগুলি একটু ধারালো করে নিয়ে তারা ঐ হাত-কুড়ুল তৈরি করত। ঐ হাত-কুড়ুল দিয়ে তারা নানা ধরনের কাজ করত। তারা গাছের ডাল থেকে তীর আর ধনুক ও বর্শার হাতল তৈরি করতে শিখল। আর সেই বর্শা বা তীরের মুখে পাথরের ফলা লাগিয়ে রাখত। পাথরের তৈরী পাত্রে জল রাখত। পাথরের প্রদীপ তৈরী করে তাতে জন্তুর চর্বি জ্বালিয়ে গুহা আলোকিত করত।



পুরা প্রস্তর যুগের অ-মসৃণ হাতিয়ার

হাজার হাজার বছর ধরে এই পাথরের তৈরী জিনিসপাত্রের ধরন আর সংখ্যা বেড়ে গেল। আদিম মানুষ জীবজন্তুর হাড় এবং কাঠ ছাড়া একমাত্র পাথরের জিনিসপত্র তৈরি করেই ব্যবহার করতে লাগল। তারা নানা রকম রং গুলে নিজেদের সাজাত। আবার শাঁখ, ঝিনুক আর পাথরের মালা গলায় পরত। হাজার হাজার বছর ধরে সেই আদিম মানুষ এই ধরনের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র আর জিনিসপত্র নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করত। এই দীর্ঘ সময়কে বলা হয় পুরা প্রস্তর যুগ। আমাদের দেশেও নানাস্থানে এই পুরা প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

নব্য প্রস্তর যুগ :—পৃথিবীতে প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ কমে আসতেই মানুষ গুহা ছেড়ে নদী আর জলার ধারে ধারে বাসা বাঁধল। বাসা বলতে জন্তু-জানোয়ারের চামড়া দিয়ে তাঁবু কিংবা বাঁশ-কাঠ-লতা-পাতা ঘেরা একটা মাথা গোঁজবার স্থান। এদিকে বহুদিনের অভিজ্ঞতায় তাদের পাথরের হাতিয়ার এবং দরকারী জিনিসগুলিও ধীরে ধীরে মসৃণ আর ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠল।



নব্য প্রস্তর যুগের মসৃণ হাতিয়ার

পাথর গুড়ো করে ভেজা বালি দিয়ে পাথর পালিশ করবার কায়দা ইতিমধ্যেই তারা শিখে ফেলেছিল। বিশেষ করে তারা বেশ সুন্দর সুন্দর হাতুড়ি এবং কুড়ুল তৈরি করতে শুরু করল। হাতুড়ি এবং কুড়ুলে মাপ মত ছিদ্র করে কাঠের হাতল লাগাবার কায়দাও তারা রপ্ত করে ফেলল। এই সময় পাথরের বর্শা ও তীরের ফলাগুলো গাছের পাতার মত সুন্দর ও ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠল। আবার ফাঁপা বাশ বা কাঠের মধ্যে খাজ কেটে তার মধ্যে বর্শা লাগিয়ে তা হাতের চাপে দূরে ছোঁড়বার কৌশলও তারা আয়ত্ত করল। টুকরো টুকরো পাথর ঘসে ঘসে কোদাল, খন্তা, মাছ ধরবার বড়শি, ছুরি প্রভৃতি বানাতে লাগল। গোটা গাছের ভেতরটা বের করে

নিয়ে কাঠের ডোঙ্গা আর ভেলা বানিয়ে চামড়া দিয়ে মুড়ে জলের মধ্যে মাছ শিকার করত।

পাথরের এইসব ধারালো আর মসৃণ যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের যুগকে বলা হয় নব্য প্রস্তর যুগ। ভারতেও এ যুগের নিদর্শন নানা স্থানে পাওয়া গেছে। কাশ্মীর উপত্যকায় শ্রীনগর থেকে কিছুটা দূরে একটি জায়গায় মসৃণ পাথরের ব্যবহারকারী নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। এরা মাটির মধ্যে গর্ত করে বাস করত। মসৃণ পাথরের কুড়ুল ছাড়াও তারা ছুঁচ, বাটালি প্রভৃতি হাড়ের জিনিস বানাতে জানত।

পুরা প্রস্তর যুগে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না, তাকে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে থাকতে হত। সেদিন মানুষ ছিল প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল। কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ প্রকৃতির এই দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পেল। এই দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবার একটা প্রধান হাতিয়ার এল তার হাতে। এই মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ কৃষিকাজ আবিষ্কার করা। মানুষের জীবন-যাত্রার ছক গেল পাল্টে। কেননা মানুষ এবার খাদ্য উৎপাদনের কাজে নামল। পশুর মত পশুর পেছনে তাড়া করে ছুটে চলবার জীবনের অবসান ঘটল।

কৃষি কাজের জন্য চাই অনেকটা সময়। এর জন্য চাই জমি তৈরি করা, জল সেচের ব্যবস্থা করা, বীজ বোনা, ফসল কেটে ঘরে তোলা। মানুষ হল স্থিতিশীল। জমি, চাষবাস ফেলে আর দেশ দেশান্তরে তাদের ঘুরে বেড়াতে হল না। বছরের পর বছর একই জায়গায় তারা দল বেঁধে বাস করতে লাগল। এইভাবে পত্তন হল গ্রামের।

নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লব :—ইতিহাসে মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তনের দুটি ধারা দেখা যায়। একটি ঘটে ধীর গতিতে, আর একটি ঘটে অত্যন্ত দ্রুত তালে। পুরা প্রস্তর যুগে এই পরিবর্তনের গতি ছিল অত্যন্ত ধীর। পুরা প্রস্তর যুগ থেকে নব্য প্রস্তর যুগে আসতে মানুষের কয়েক লক্ষ বছর লেগেছিল। কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগে

সেই আদিম মানুষের জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন এল তাকে বিপ্লব বলা যেতে পারে। এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর নানা জায়গায় চাষবাস শুরু হয়ে গেল। ঐ সব জায়গায় মাঠগুলো যব আর গমের সোনালী শীষে ভরে উঠল। প্রাকৃতিক জলাধারার গতিকে মানুষ বুঝে নিল। তারা খাল কেটে বড় বড় কাঠ বা পাথরের গামলা খাটিয়ে জল সেচ করতে লাগল।

পশুপালন :—ইতিমধ্যে মানুষ বনের পশুকে বশ মানাতে শিখেছে। প্রথমে শিকারী মানুষ বনজঙ্গল পরিষ্কার করে পশুদের চারণভূমি তৈরি করল। তারপর তাদের সুবিধামত কতকগুলি পশুকে বেছে নিয়ে পোষ মানাতে লাগল। এইভাবে কুকুর, গরু, শুয়োর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি বন্য জন্তু গৃহপালিত পশুতে পরিণত হল। এইসব পশুকে পোষ মানানোর ফলে তাদের অনেক সুবিধে হল। তারা গরু ও ছাগলের দুধ দুইয়ে খেতে শিখল। কুকুর নিয়ে শিকার করতে যেত। ছাগল, শুয়োর আর ভেড়ার মাংস খেত। বলদ আর গাধার পিঠে মাল বোঝাই করে নিয়ে যেত।

মাটির পাত্র ও কুমোরের চাক :—চাষের ফসল ঘরে তুলে রাখতে চাই পাত্র। আবার জল ধরে রাখা, রান্না বান্না করবার বা খাবার দাবার জন্যও চাই পাত্র। পাথর খুদে বা চামড়া দিয়ে এইসব পাত্র তৈরি করতে ছিল অনেক ঝামেলা। এই তাগিদ থেকেই তারা একদিন মাটি দিয়ে পাত্র তৈরি করবার কৌশল রপ্ত করল। রোদে শুকিয়ে এবং আগুনে পুড়িয়ে নিলে মাটির পাত্র জলও শুষে নেয় না আবার বৃষ্টিতেও গলে যায় না। তারা তাই মাটির তালকে জল দিয়ে নরম করে নিয়ে হাত দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে নানা ধরনের হাঁড়ি-কুড়ি বাসনপত্র তৈরি করতে শিখল। তারপর তাকে শুকিয়ে পুড়িয়ে নিত। এতেও কিন্তু অনেক সময় লাগত। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে তারা একদিন কুমোরের চাক বানাল। ফলে অত্যন্ত কম সময়ে নানা ধরনের মাটির পাত্র তৈরি হতে লাগল।

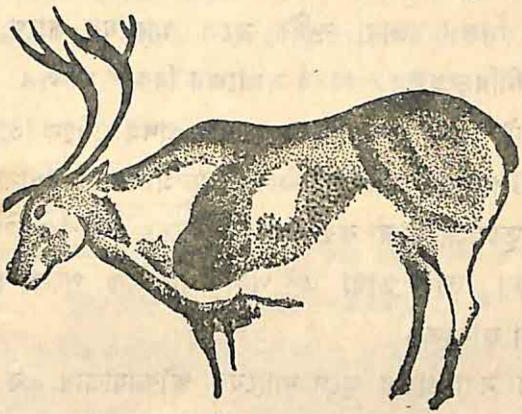
পোশাক পরিচ্ছদ :—আদিম মানুষ প্রথমে কাপড়-চোপড় কিছুই

পরত না। কিন্তু শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা জন্তু জানোয়ারের লোম শুদ্ধ চামড়া জড়িয়ে থাকত। গাছের বাকল বা পাতার তৈরী পোশাকও পরত। কিন্তু চাষবাস করার পর তারা গাছের আঁশ থেকে সুতো তৈরি করবার জিনিসের সন্ধান পেল। আবার পোষ মানা ভেড়ার লোম ছেঁটে পশমের পোশাক তৈরি করবার কায়দাও শিখল। আস্তে আস্তে তারা তকলি দিয়ে সুতো কাটবার এবং কাঁটা দিয়ে পশম বোনবার কৌশল আয়ত্ত করল। এইভাবে তারা নানা রকমের পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি করতে শিখল।

ঘর-বাড়ী:—চাষের জমির কাছে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তারা প্রথম ঘর-বাড়ী তৈরি করতে শিখল। প্রথমে তারা পাথর দিয়ে ঘর তৈরি করল। চাষের জমি তো প্রথমে খুব বেশী ছিল না। তাদের ভয় ছিল বাইরের থেকে অন্যরা এসে তাদের ঘর-বাড়ী, চাষবাসের জমি দখল করে নেবে। তাই তারা তাদের ঘর-বাড়ী প্রভৃতি রক্ষা করবার জন্য চারপাশে পাথরের দেয়াল তুলে দিত। একটু গরম জায়গায় মানুষ মাটির বাড়ী তৈরি করে মাথায় কাঠ, বাঁশ, লতা-পাতা চাপিয়ে দিত। আবার ঘরের মাঝখানে চৌকো করে গর্ত কেটে শোবার জায়গা তৈরি করত। পরে কিন্তু তাদের দেয়াল এবং মেঝেগুলো বেশ সুন্দর করে মাজা ঘসা থাকত। ঘরের মেঝেতে তারা উঁচু জায়গায় শয়ন করত। রান্নাবান্নার জন্যও আলাদা জায়গা থাকত।

পরিবহণ:—পশুকে পোষ মানাবার পর মানুষ বলদ আর গাধার পিঠে চাপিয়ে দিত মালপত্তর। বুদ্ধি করে নিজেও তাদের ওপর চেপে বসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করত। পরে তারা আবিষ্কার করল চাকার গাড়ী। বলদ টানা এই সকল গাড়ীর চাকা প্রথমে ছিল নিরেট। চাকা ঘোরাবার ব্যবস্থা ছিল না। অনেক পরে মানুষ চাকা ঘোরাবার কৌশল বের করল। জলে মাছ ধরা বা যাতায়াতের জন্যও তারা প্রথমে ভেলা, পরে নৌকো তৈরি করল। যাতে জল ঢুকতে না পারে তার জন্য চামড়া দিয়ে নৌকোর তলাটা মুড়ে দেওয়া হত।

শিল্প ও বিশ্বাস ঃ—খাদ্য উৎপাদন করার কাজে লাগাবার পর মানুষ অবসর পেল। এবারে মানুষের সৃষ্টি করার ক্ষমতা নানা দিকে প্রকাশ পেতে লাগল। তারা মাটির পুতুল তৈরি করতে শিখল। হাঁড়ি-কুড়ির ওপর রং বেরংয়ের নক্সা কাটতে লাগল। পাথর, হাড়, শিংয়ের বিচিত্র সব শিল্প কাজ দেখা গেল। কিন্তু তাদের দক্ষতা সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেল পাহাড়ের গুহায় নানা রংয়ের ছবি আঁকাতে। এইসব গুহা চিত্রের নিদর্শন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে। এই ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল পুরা প্রস্তর যুগের



বল্লা হরিণ (প্রাচীন গুহা চিত্র)

শেষের দিকে। গিরিমাটি, কাঠকয়লা প্রভৃতি পশুর চর্বিতে গুলে নিয়ে তারা প্রদীপের আলোতে ছোট বড় জন্তু জানোয়ারের শিকারের দৃশ্য এঁকে রাখত। পৃথিবীর নানা স্থানে এই আদিম চিত্রকরদের আঁকা গুহা চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের দেশেও উত্তর-প্রদেশের মীর্জাপুরের কাছে পাহাড়ের গুহায় এই ধরনের চিত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। এইসব ছবিগুলি ছিল অত্যন্ত জীবন্ত।

এই ছবিগুলি থেকে মানুষের আদিমতম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা জাদু আর তুকতাকে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত তাদের ছবির জাদুতে তাদের শিকার হবে সহজ। তারা শিকারে যাবার আগে শিকারের নাচ নাচত। কেউ কেউ মৃত জন্তুর ছাল চামড়া

গায়ে জড়িয়ে শিং লাগিয়ে জানোয়ারের অভিনয় করত। আর অভিনয়ের মধ্যে জন্তু শিকার করতে পারলে তাদের আসল শিকার সফল হবে বলে তারা মনে করত।

ভাষা :—মানুষ আগে আকার ইঙ্গিতে কিংবা শব্দ করে মনের ভাব প্রকাশ করত। কিন্তু তারা যখন দল বেঁধে গ্রামে গঞ্জে বসবাস করতে শুরু করল, তখন তাদের কাজকর্ম ও জিনিসপত্রের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল। তখন আর আকার ইঙ্গিতে বা মুখের শব্দে ভাবের আদান প্রদান চলল না। এইভাবে মুখের শব্দই একসময় আদিম ভাষার রূপ নিল। ভাষা সৃষ্টির ফলে মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ নিবিড় হল। মানব সমাজের বিকাশ ঘটল।

দেবীর উপাসনা :—কৃষি সমাজের প্রথম দিকে প্রায় সর্বত্র ভূ-মাতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। ভূ মাতার উপাসনা মানে পৃথিবীকে মাতৃজ্ঞানে পূজো করা। মাটি মায়ের মত শস্য দিয়ে পালন করে মানুষকে। তাই তারা এই পৃথিবী-দেবীকে পূজো করে শস্য বৃদ্ধির প্রার্থনা জানাত।

এইভাবে নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। এর ফলে মানব সভ্যতার প্রথম পদধ্বনি শোনা গেল।

অনুশীলনী

(ক) পিকিং মানুষ কাদের বলা হয়? তারা যে আগুনের ব্যবহার করত, কি ভাবে তা জানা যায়? আদিম মানুষের আগুনের ব্যবহারে কি সব সুবিধা হয়েছিল?

(খ) আদিম মানুষের জীবন যাত্রা কিরূপ ছিল? তারা কি ভাবে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করত?

(গ) কোন্ সময়কে পুরা প্রস্তর যুগ বলা হয়? এই সময় মানুষদের প্রধান হাতিয়ার কি ছিল? কি ভাবে ঐগুলি তৈরি হত? দু' একটি উদাহরণ দাও।

(ঘ) কোন্ সময়কে নব্য প্রস্তর যুগ বলা হয়? এই সময় মানুষের

হাতিয়ারের রূপ কি ছিল? তারা কি ভাবে খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হল? কেন তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল?

(ঙ) ইতিহাসে বিবর্তন এবং বিপ্লব কাকে বলা হয়? নব্য প্রস্তর যুগকে আমরা বিপ্লব বলব কেন?

(চ) মানুষ পশু পালন করতে শিখল কেন? এতে তাদের সুবিধে কি হল? মাটির পাত্র কি ভাবে তারা তৈরি করত?

(ছ) নব্য প্রস্তর যুগে কি ভাবে মানুষ ঘরবাড়ী তৈরি করল? তাদের পরিবহণ কেমন ছিল? তারা কিভাবে এবং কিসের পোশাক তৈরি করত?

(জ) তারা প্রথমে কিভাবে জীবনযাপন করত? কি কারণে মানুষ গুহার দেয়ালে ছবি আঁকত। কি দিয়ে তারা ছবি আঁকত?

(ঝ) এইসব ছবিতে কি থাকত? এইসব ছবি থেকে তাদের বিশ্বাসের কি সবকথা জানা যায়?

(ঞ) আদিম মানুষ ভূ-মাতার পূজো করত কেন?

(ট) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

—ব্যবহার করার কৌশল আয়ত্ত করা হল আদিম মানুষের একটি বড় আবিষ্কার। পুরা প্রস্তর যুগের মানুষের হাতিয়ারগুলি ছিল —। নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলি ধীরে ধীরে— আর — হয়ে উঠলো। কৃষিকার্যের ফলে মানুষ হল —।

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

নব্য প্রস্তর যুগের শেষের দিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্বপারে যারা বসতি গড়েছিল, তারা এক নতুন জিনিস আবিষ্কার করল। পাথরের জিনিসপত্র তৈরি করতে করতে একদিন তারা উজ্জ্বল কিছু গলতে দেখল। সেটি হল তামা। এই তামা পাথরের সাথে মিশে থাকলেও, তাকে আগুনে একটা তাপমাত্রায় গলিয়ে নিয়ে পাথরের ছাঁচে ঢেলে ঠাণ্ডা করে নানা রকমের জিনিস তৈরি করা যেত। মানুষ মাথা খাটিয়ে পাহাড় থেকে তামা উদ্ধার করবার একটা কৌশল বের করল। আগুনে প্রথমে তারা পাথর গরম করত। পাথর তেতে গেলে জল ঢেলে দিত। এতে পাথর ফেটে তামা বেরিয়ে আসত। এর ফলে তামার নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র—কুঠার, বর্শা, তীর, বাঁটুল প্রভৃতি তৈরি হতে লাগল। এছাড়া তৈরি হল খুর, আয়না, মাছ ধরার বঁড়শি, শস্য কাটার কাস্তে, সেলাই করার ছুঁচ, আরও হরেক রকমের ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্তর।

কিন্তু তামার জিনিস খুব একটা শক্ত ছিল না। তামার সঙ্গে কিছুটা টিন মেশাতে তামার জিনিসগুলি বেশ শক্ত আর মজবুত হল। এই তামা আর টিনের মিশ্রণে এক নতুন মিশ্র ধাতুর আবিষ্কার ঘটল। এর নাম ব্রোঞ্জ। জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি ব্রোঞ্জে তৈরি হতে লাগল। কিন্তু ব্রোঞ্জের আবিষ্কারে সব থেকে সুবিধে হল চাষবাসের কাজে। এতদিন লাঙ্গলের ফলা ছিল কাঠের। শক্ত মাটি চাষ করতে গেলে সেগুলো ভেঙ্গে যেত আর ফলাও মাটির গভীরে যেত না। এবারে ব্রোঞ্জের ফলা হওয়াতে চাষের কাজে খুব সুবিধা হল। এইভাবে এই নতুন ধাতুর আবিষ্কারে মানুষ আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে নব্য প্রস্তর যুগ থেকে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে প্রবেশ করল। আর সেইসাথে মানুষের জীবনযাত্রায় এল কতকগুলি বিশেষ পরিবর্তন।

গ্রাম থেকে নগর :—ব্রোঞ্জের প্রচলন হবার সময় গ্রামগুলি অতি দ্রুত নগরীতে পরিণত হল। আগে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল জলার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু নগরগুলির পত্তন হয়েছিল পলিমাটি দিয়ে গড়া নদীর মোহনার কাছাকাছি নীচু জমিতে। এবারে তারা বড় বড় ক্ষেতে নদীর জল ব্যবহার করে শস্য বুনতে শিখল। এর জন্য প্রয়োজন হল মজবুত বাঁধ বাঁধা, সেচের খাল কাটা ইত্যাদি। ফলে পাহাড় থেকে পাথর কেটে আনতে হল। এইসব কাজে অনেক মানুষের প্রয়োজন হল। যব, গম ছাড়াও শন প্রভৃতির চাষ শুরু হল। ঘরবাড়ীগুলিও এখানে নতুন রূপ নিল। পাথর দিয়ে কিছু কিছু বড় বড় বাড়ী তৈরি হল। কিন্তু নগরগুলিতে রোদে শুকিয়ে নেওয়া কাঁচা ইট বা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া পাকা ইটে ঘর-বাড়া বেশী সংখ্যায় তৈরি হল।

সুদক্ষ কারিগর :—এদিকে নগরগুলির বাইরে বিরাট এলাকা জুড়ে চাষবাস শুরু হল। এজন্য দরকার হল প্রচুর লাঙ্গলের ফলা, কাস্তে, ঝাড়াই-মাড়াই করার যন্ত্র, যব-গম পেষার জাঁতা, শস্য বইবার চাকাওয়ালা গাড়ি ও নৌকো, শস্য রাখবার মড়াই প্রভৃতি। আর লোকখংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে দৈনন্দিন ব্যবহারের নানা ধরনের প্রচুর মাটির পাত্রের প্রয়োজন হল। আগে ঘরে ঘরে সবাই দরকার মত কাপড়-চোপড় তৈরি করে নিত। কিন্তু এখন চাহিদা গেল অনেক বেড়ে। ফলে এইসব কাজে একদল মানুষ লেগে রইল। এইভাবেই সেই নতুন নগর-সমাজে বেশ কয়েকটি বৃত্তি বা পেশার সৃষ্টি হল। অনেকদিন ধরে একই কাজ করবার ফলে সমাজে কামার, কুমোর, তাঁতী, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি সুদক্ষ কারিগর ও শিল্পী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল।

ব্যবসা-বাণিজ্য :—এইসব কারিগর বা ক্ষেতে খামারে যারা কাজ করত তারা পেত শস্য। তখনকার দিনে খাদ্য শস্যই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থাৎ একটা কাস্তে, কাপড় বা হাঁড়ির বদলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য মিলত।

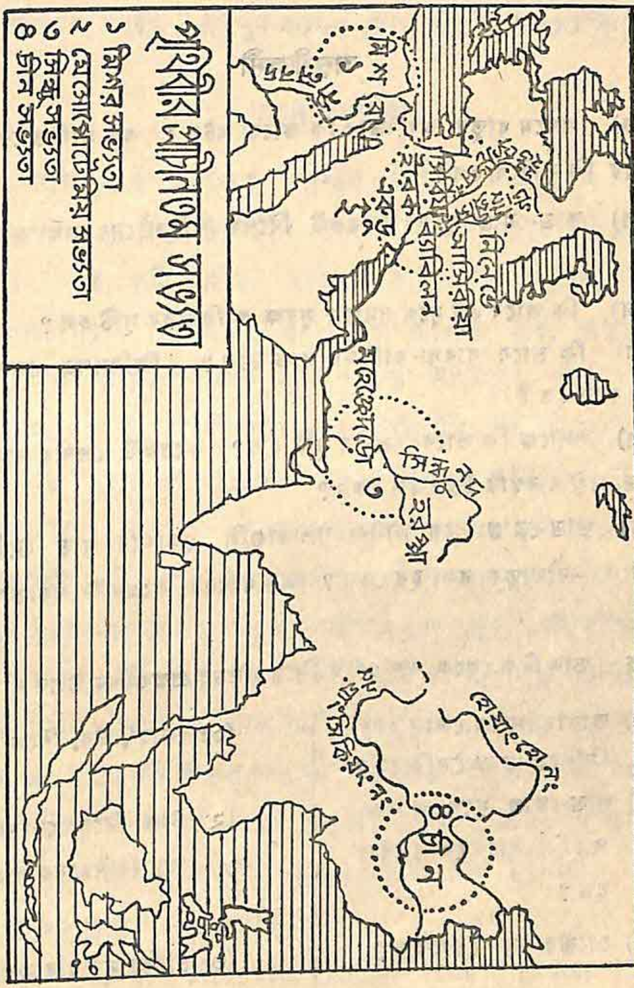
একদল মানুষ আবার ব্যবসায়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদনের দায় থেকে মুক্তি পেল। তারা বাইরের গ্রাম বা নগরে তাদের দেশের নানা ধরনের মালপত্র বলদ টানা গাড়ীতে ও গাধার পিঠে বোঝাই করে বা নৌকোতে চাপিয়ে নিয়ে যেত। সেগুলি বিক্রি হত শস্যের বিনিময়ে। এই ভাবে শুরু হল ব্যবসা বাণিজ্য।

সমাজ জীবনে পরিবর্তন :—এমনি করেই সৃষ্টি হল নানা বৃত্তির। মানুষের সমাজে দেখা দিল শ্রেণী বিভাগ। যারা খাদ্য শস্য বা অন্যান্য ভোগের জিনিসপত্র উৎপন্ন করত, তারা কিন্তু সমাজে খুব বড় স্থান পেল না। বড় স্থান পেল তারা, যারা এইসব শ্রেণীর মত মোটেই খাটত না। তারা ছিল শক্তিমান। বড় বড় জমির মালিক ছিল তারা। ব্যবসায়ী শ্রেণীও পরের তৈরী জিনিস নিয়েই কেনা বেচা করত। আর এই দুই শ্রেণীর মাঝে ছিল আর এক শ্রেণীর মানুষ। তারা জিনিসপত্রের হিসেব রাখত, দোকানে পসার সাজিয়ে জিনিস-পত্র বিক্রী করত, রাস্তা তৈরি, বাঁধ বাঁধা প্রভৃতি কাজের তদারকী করত। এরজন্যও তারা পেত শস্য।

উপজাতি সংঘর্ষ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব :—গ্রাম-সমাজে মানুষের পরিবার ও তাদের আত্মীয় স্বজন নিয়ে এক একটি উপজাতির সৃষ্টি হয়েছিল। এইসব উপজাতিগুলির মধ্যে চাষের জমির দখল নিয়ে প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটত। নগর গড়ে ওঠার পরও এসব সংঘর্ষের শেষ হয়নি। আবার বাইরের উপজাতিরাও নগরগুলি দখল করবার জন্য হামলা করত। নগরের ভেতরে শান্তি রক্ষার এবং বাইরের আক্রমণের হাত থেকেও নগর রক্ষার প্রয়োজন দেখা দিল। এরজন্য তৈরি হল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবাহিনীর। আবার সৈন্যবাহিনীর রসদ চাই, পোশাক চাই, অস্ত্র চাই। এসবের জন্য চাই আবার একটা শক্তিশালী সংগঠিত শাসন ব্যবস্থা। এই ভাবেই সমাজে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠল।

নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশ :—তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সব সভ্যতাই নদীমাতৃক। নদীর উৎস-ধারাই যেন ছিল এই নগরগুলির প্রাণ-

প্রবাহ। মায়ের মতই এই সব নদী জল আর পলি দিয়ে ঐসব নগরের মানুষের মুখের অন্ন জোগাত। নদীর ধারে ধারে যে সমস্ত



উষ্ণ অঞ্চলে ধানের সাথে গম আর যব জন্মাত, সেইসব জায়গাতেই মানুষ তাদের সর্বপ্রথম নগর-সভ্যতা গড়ে তোলে। এইভাবে নীল নদকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল মিসরীয় সভ্যতা, টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, ইয়াং-

সিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর আশ-পাশে ঘিরে চীন সভ্যতা, আর সিন্ধু নদের উপত্যকায় সিন্ধু সভ্যতা।

অনুশীলনী

(ক) প্রথমে ধাতুর আবিষ্কার কি ভাবে ঘটল? এই আবিষ্কারের ফলে মানুষের কি সুবিধে হল?

(খ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তনের কথা আলোচনা কর।

(গ) কি ভাবে এই যুগে সমাজে সুদক্ষ কারিগরের সৃষ্টি হল?

(ঘ) কি ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠল? জিনিসপত্র কেনা বেচা কেমন করে হত?

(ঙ) সমাজে কি ভাবে শ্রেণীর সৃষ্টি হল? কয়েকটি শ্রেণীর নাম কর। সমাজে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব হল কেন?

(চ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে মানব সভ্যতাগুলি কোথায় গড়ে উঠেছিল? এগুলিকে নদীমাতৃক বলা হয় কেন? এই ধরনের কয়েকটি সভ্যতার নাম কর।

(ছ) ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

(১) তামার সাথে কোন্ ধাতু মিলিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি হয়?	(১) লোহা, টিন, শিসে।
(২) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে জিনিসপত্র কি ভাবে কেনা বেচা হত?	(২) টাকা দিয়ে, সোনা দিয়ে, শস্য বিনিময়ের মাধ্যমে।
(৩) রাষ্ট্রের উদ্ভব কেন হল?	(৩) চাষের সুবিধার জন্য, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, ভেতরে বাইরে শান্তি রক্ষার জন্য।
(৪) নদীর উপত্যকায় প্রথম সভ্যতাগুলি কেন গড়ে উঠল?	(৪) চাষবাসের জন্য, পানীয় জলের জন্য, স্নানের সুবিধার জন্য।

চতুর্থ অধ্যায়

সভ্যতার উন্মেষ [খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ পর্যন্ত]

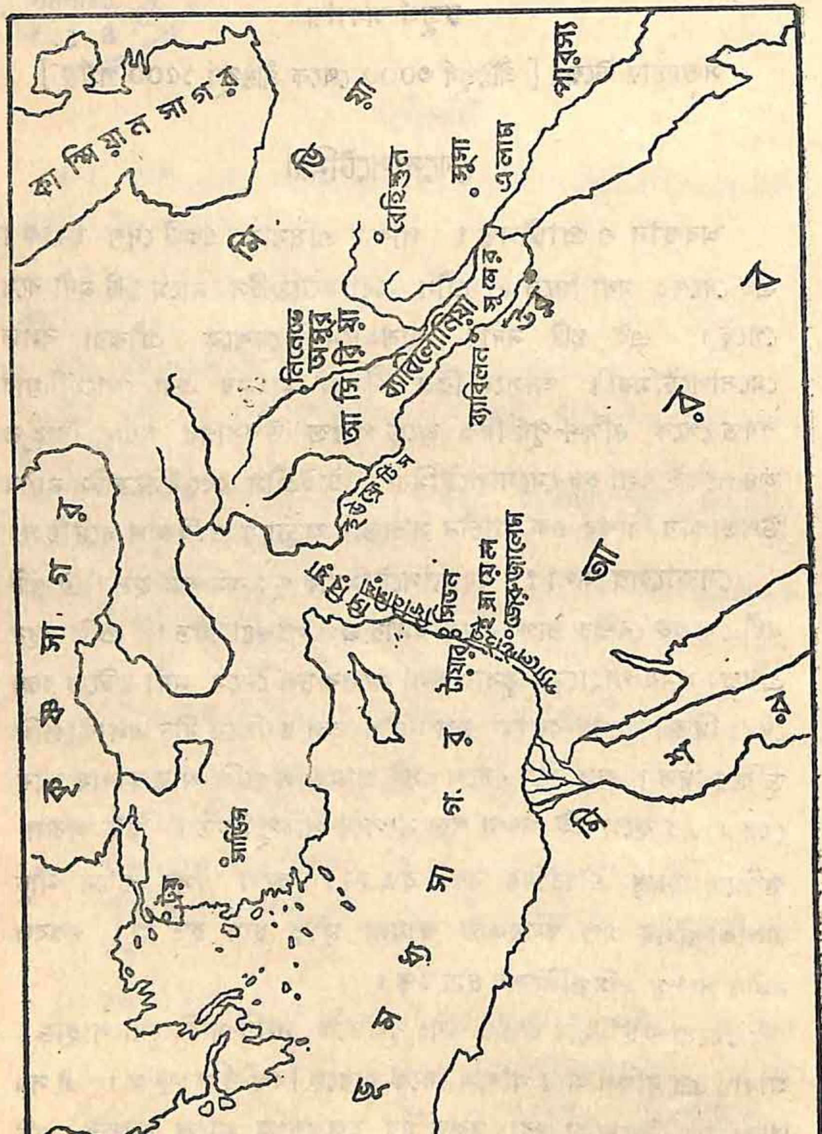
মেসোপটেমিয়া

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব ঃ পশ্চিম এসিয়ার একটি দেশ ইরাক। এই দেশের মধ্য দিয়ে টাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিস নামে দুটি নদী বয়ে গেছে। এই দুটি নদীর মাঝখানের দেশকে গ্রীকরা বলত মেসোপটেমিয়া। আসলে কিন্তু এসিয়া মাইনর এবং আর্মেনিয়ার পর্বত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিক জুড়ে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকেই বলা হয় মেসোপটেমিয়া। টাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় বিশ্বের এক প্রাচীন সভ্যতার অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘটেছিল।

সেকালের কথা ঃ মেসোপটেমিয়ায় খুব কম বৃষ্টি হত। ঐ দুটি নদী থেকেই বেশীর ভাগ প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যেত। প্রতি বছর গ্রীষ্মের সময় পাহাড়ের তুষার গলা জলের ঢল নেমে নদী দুটিতে বন্যা দেখা দিত। সেই বন্যার জল নদীর কূল ছাপিয়ে নীচু এলাকাগুলি ডুবিয়ে দিত। জল কমে গেলে সেই স্থানগুলি পলি আর কাদায় ভরে যেত। এর ফলে এই অঞ্চল শস্য সম্পদে পরিপূর্ণ হত। উঁচু অঞ্চল-গুলিতে কিন্তু এ ধরনের বন্যা হত না। ফলে ঐসব স্থানে নীচু এলাকাগুলির মত অনেকটা জায়গা জুড়ে চাষ হত না। কেবল নদীর সংলগ্ন জমিগুলিতেই চাষ হত।

মেসোপটেমিয়ার উত্তর এবং পূর্বদিকে সারি সারি চূণা পাহাড়। আবার এর দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে রয়েছে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। ঐ সব পাহাড়ের উপত্যকা এবং মরুভূমির বুক থেকে মাঝে মাঝেই তাই এই উর্বর অঞ্চলে নেমে আসত নানা জাতের মানুষ। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুমেরীয় নামে এক জাতের মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল। তখন কিন্তু এলাকাটি মোটেই চাষবাসের উপযোগী ছিল না—শ্যাওলা

আর জলা-গাছপালায় ভর্তি ছিল। কয়েক'শ বছর ধরে তাদের



চেষ্টায় এইসব অঞ্চল গম, যব প্রভৃতি শস্যে ভরে ওঠে, আর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বিশ্বের এক আদিমতম সভ্যতা।

সভ্যতা সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ :— এখন প্রশ্ন জাগবে এই বিরাট পৃথিবীতে মেসোপটেমিয়াতেই কেন সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটল ? এর কিন্তু বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। শুকনো আর ঠাণ্ডা জল হাওয়ার জন্য পশ্চিম এশিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলেই প্রথম বুনো ঘাসের সাথে গম আর যবের চারা জন্মাত। আবার মেসোপটেমিয়ার কাছাকাছি এলাকায় বুনো ছাগল, গরু, ভেড়া প্রভৃতি জন্তু চড়ে বেড়াত। উর্বর জমি, পোষ মানানো পশু এবং সহজে গম আর যবের বীজ পাওয়া যেত বলেই এই অঞ্চলেই সর্বপ্রথম ব্যাপক চাষ-আবাদ শুরু হয়। এর ফলে লোকের বসতি বাড়ে এবং ক্রমান্বয়ে সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

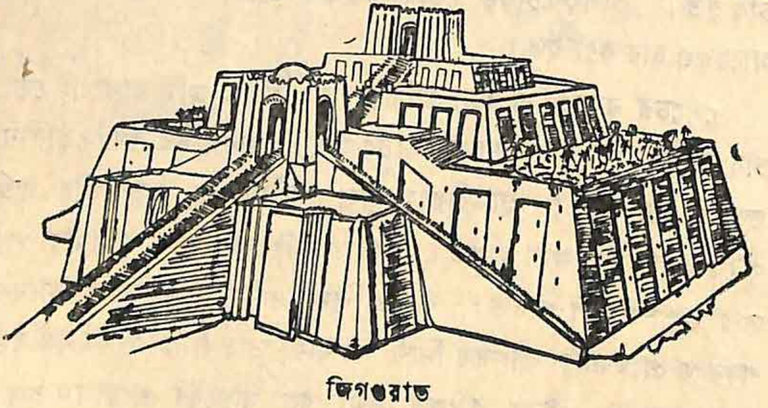
চাষবাস :—আজ থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে সুমেরীয়গণ মেসোপটেমিয়ার নীচু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তখন এই অঞ্চল অরণ্য আর জলাভূমিতে পরিপূর্ণ ছিল। অনেক পরিশ্রম করে তারা জমা জল বের করে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষবাস শুরু করে। পলি পড়াতে জমি খুব উর্বর ছিল। তাই ফসলও ফলত প্রচুর। কথিত আছে যে এইসব স্থানে বোনা বীজের একশ গুণ ফসল ফলত। গম আর যবই ছিল প্রধান শস্য। এছাড়া নানা ধরনের ফল আর সবজির চাষ হত। কাপড়-চোপড় তৈরি করবার জন্য শণ এবং আঁশযুক্ত গাছেরও চাষ করা হত।

সেচের ব্যবস্থা ও বন্যা প্রতিরোধ : উর্বর জমি থাকলেই তো চাষ হয় না। চাষের জন্য চাই সেচের জল। অনাবৃষ্টির সময় কোথায় জল পাওয়া যাবে ? সুমেরীয়রা বুদ্ধি খাটিয়ে বড় বড় গভীর গর্ত খুঁড়ে বন্যার জল জমা রাখত। আবার নদী থেকে জল আনবার জন্য তারা সেচের খাল কাটত। বন্যার সময় নদীর জল যাতে তাদের শহর ও গ্রামগুলি ভাসিয়ে নিয়ে না যায় তার জন্য তারা বড় বড় বাঁধও বাঁধত। এইসব কাজের জন্য বহু মানুষের প্রয়োজন হল। এইভাবে সকলের স্বার্থে পরস্পরের সাহায্যে সংগঠিত সমাজ গোষ্ঠীর উদ্ভব হল।

বিভিন্ন বৃত্তি : অধিকাংশ সুমেরবাসী চাষবাস আর পশু পালনের কাজে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু চাষবাস ছাড়াও আরও অনেক কারিগর ও শিল্পী নানা কাজ করে তাদের জীবিকা অর্জন করত। এদের মধ্যে ছিল কুমোর, যারা চাকা ঘুরিয়ে নানা রকমের মাটির পাত্র তৈরি করত। একদল শ্রমিক ইট তৈরি করত আর ঐ ইট দিয়ে ঘর-বাড়ী তৈরির জন্য একদল রাজমিস্ত্রি কাজ করত। সুতা কেটে তা থেকে পোশাক তৈরি করত একদল। সুমেরীয়দের পশমের পোশাকের খুব খ্যাতি ছিল। তারা আবার তামার সাথে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখেছিল। ফলে তামা ও টিন জোগাড় করবার জন্য একদল মানুষ খনির কাজে লাগল। আবার ঐ সব ধাতু গলিয়ে তা থেকে নানা যন্ত্রপাতি ও ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্র তৈরি করবার জন্য একদল দক্ষ শিল্পীর সৃষ্টি হল। বলদ আর গাধা টানার গাড়ী, নৌকো প্রভৃতি যানবাহন নির্মাণের কাজেও অনেকে নিযুক্ত ছিল। এ ছাড়া ছিল ব্যবসায়ী, পুরোহিত, কর্মচারী, শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ।

সুমেরীয়দের অবদান

বিশাল গম্বুজ : সুমেরীয়দের সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি



জিগগুরাত

জিগগুরাত। এই জিগগুরাতগুলি ছিল মন্দিরের উপর নির্মিত এক ধরনের গম্বুজ। কাঁচা আর পাকা ইট দিয়ে চারদিকে বেড় দিয়ে

জিগগুরাতগুলি ধাপে ধাপে গেঁথে তোলা হত। ওপরের দিকটায় কয়েকটি থাক থাকত। একেবারে নীচে থাকত ঢোকবার দরজা। সেখান থেকে ওপরে ওঠবার জন্য প্রায় একশটি ধাপের তিনটে আলাদা সিঁড়ি থাকত। উর নামক একটি স্থানের মাটি খুঁড়ে সাতশ ফুট বেড় দেওয়া প্রায় আশি ফুট উঁচু একটি জিগগুরাতের সন্ধান পাওয়া গেছে।

মন্দির : সুমেরীয়দের মন্দিরগুলি বিরাট এলাকা নিয়ে নির্মিত ছিল। তার মধ্যে থাকত অনেকগুলি বড় অট্টালিকা। এ সমস্তই ছিল কিন্তু ইটের গাঁথনি দিয়ে তৈরি। ঐ ইমারতগুলির চারপাশে উঁচু প্রাচীর দেওয়া থাকত। এগুলির গাঁথনি ছিল খুব শক্ত। দরজা এবং খিলানগুলি ছিল ধনুকের ছিলার মত।

দেয়াল চিত্র : মন্দির এবং প্রাসাদের দেয়ালে এক ধরনের আস্তরের পোঁচ লাগিয়ে সুমেরীয়রা নানান রং দিয়ে সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কন করত। এই সব চিত্রে সমাজের অনেক রকমের দৃশ্য এবং ঘটনা ফুটে উঠত।

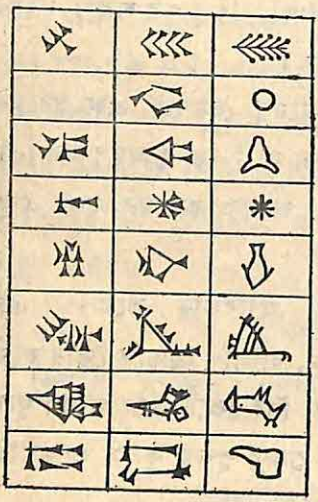
প্রস্তর শিল্প : সুমেরীয়রা ব্রোঞ্জ আবিষ্কার করে। এই আবিষ্কারের ফলে ব্রোঞ্জের হাতুড়ি, ছেনি, বাটালি প্রভৃতি তৈরি হতে লাগল। ফলে পাহাড় থেকে পাথরের চাঁই কেটে এনে পাথর খুদে নানা নক্সা এবং পাথরের নানা রকমের সুন্দর সুন্দর কলস ও অন্যান্য পাত্র তৈরি হতে লাগল।

ধাতু শিল্প : ব্রোঞ্জ ছাড়াও সুমেরীয়রা সোনা এবং নানা ধরনের দামী পাথর দিয়ে গয়না-গাঁটি এবং মূর্তি তৈরি করত। উর-এর একটি রাজার সমাধি খুঁড়ে এই সবের অনেক সুন্দর নিদর্শন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে রয়েছে সোনা দিয়ে নির্মিত একটা ছাগলের মূর্তি, নিরেট সোনার তৈরী একটি শিরস্ত্রাণ, সোনার হারের টুকরো, নীলকান্ত মণি দিয়ে তৈরী ষাঁড়ের মাথা প্রভৃতি।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহণ ব্যবস্থা : সুমেরীয়রা অনেকটা জায়গা জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তাদের খাদ্যশস্য ও শিল্পজাত পণ্য

বিদেশে রপ্তানি হত। আবার বিদেশ থেকেও তারা সোনা, তামা, দামী পাথর, বড় বড় ইমারত তৈরি করবার পাথরের চাঁই, কাঠ প্রভৃতি আমদানি করত। জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রচলন ছিল না। কারণ নদীর স্রোতের উজানে নৌকো চালান কঠিন ছিল। সেইজন্য গাধার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে স্থলপথে জিনিসপত্র আমদানি রপ্তানি হত। মুদ্রার চল না থাকাতে পরিমাণ মত যব, গম ও সোনা বা রূপোর বাটখারা দিয়ে ওজন করে জিনিসপত্রের দাম ঠিক করা হত।

লিপি : সুমেরীয়গণ তাদের নিজস্ব লিপির উদ্ভাবন করেছিল। সুমেরীয় সভ্যতার অগ্রগতিতে তাই লিপির প্রচলন অনেক সাহায্য করেছিল। সুমেরীয় লিপি কীলক আকারের ছিল। এজন্য তাকে কীলক লিপি বলা হয়, তিনকোণ যুক্ত গোঁজের মত হরফে নরম মাটির তালের ওপর কাঠি দিয়ে তারা লিখত। এই লেখাগুলি আবার রোদে শুকিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে টালির মত করে রাখা হত। এইভাবে মাটি দিয়ে চিঠি ভরবার খামও তৈরি হত। এই লেখা আয়ত্ত করা খুব সহজ ছিল না। লেখা শেখানর জন্য মন্দিরের লাগোয়া বিদ্যালয় থাকত। সেখানে এইসব লেখা ছাড়াও অঙ্ক এবং জ্যামিতিও শেখান হত। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, বাণিজ্য-পত্র, সরকারী নথি, দলিল-দস্তাবেজ এবং রাজার হুকুম-নামা প্রভৃতি এই হরফে লেখা হত।



কীলক লিপি

অনুশীলনী

(ক) মেসোপটেমিয়া কোন্ স্থানকে বলা হয়? এখানে কোন্ জাতির লোক এসে প্রথম বসতি স্থাপন করে? প্রথমে অঞ্চলটি কেমন ছিল? এখানে কোন্ কোন্ ফসল ফলত?

(খ) মেসোপটেমিয়াতে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ কেন ঘটল? চাষবাসের সুবিধার জন্য সুমেরীয়রা কি কি কাজ করেছিল।

(গ) কিভাবে সুমেরীয়রা বন্যা প্রতিরোধ করত? কয়েকটি কারিগর শ্রেণীর নাম কর।

(ঘ) সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড় কীর্তি কোন্‌টি ছিল? এর নিদর্শন কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে? সুমেরীয়দের মন্দির কিভাবে নির্মিত হত? এর দরজা এবং খিলানগুলি দেখতে কেমন ছিল?

(ঙ) নদী পথে সুমেরীয়রা কেন ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল করে করতে পারত না? তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সওদা কিভাবে চালান হত? জিনিসপত্রের দাম ঠিক করা হত কিভাবে?

(চ) সুমেরীয়দের প্রস্তর শিল্প এবং ধাতু শিল্প সম্বন্ধে কি জান? ব্রোঞ্জের আবিষ্কারের সাথে প্রস্তর শিল্পের সম্পর্ক কি ছিল? কোন্ কোন্ ধাতুর কাজ তারা জানত? এসব ধাতু থেকে তারা কি ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করত?

(ছ) সুমেরীয়দের লেখার হরফ দেখতে কেমন ছিল? কিভাবে এবং কিসের উপর তারা লিখত? তারা কোথায় এইসব লেখা শিখত? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে লেখার ব্যবহার হত?

(জ) শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(১) সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে—ও—নদীর উপত্যকায়।

(২) প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়ায় বুনো ঘাসের সাথে — ও — চারা গজাত।

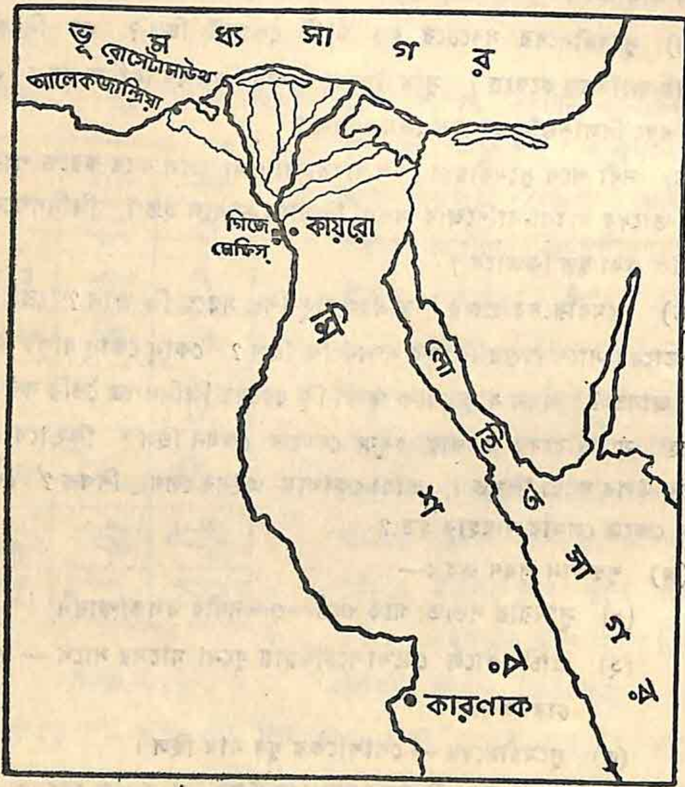
(৩) সুমেরীয়দের — পোশাকের খুব নাম ছিল।

(৪) জিগগুরাতগুলি ছিল মন্দিরের উপর নির্মিত এক ধরনের —।

(৫) সুমেরীয়দের সভ্যতার অগ্রগতিতে — প্রচলন অনেক সাহায্য করেছিল।

মিসর

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি:—মিসর আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। সুদূর অতীতে নীলনদের উপত্যকায় মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। এই উপত্যকার দু'দিকে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। আর মরুভূমির সামনে রয়েছে ছোট বড় বাদামী রঙের পাহাড়ের সারি। সেই বাদামী রঙের পাহাড়গুলির মধ্য দিয়ে একটি নীল ফিতের মত বয়ে চলেছে নীল নদ।



মিসরের আবহাওয়া শুকনো। গ্রীষ্মের সময় এখানে খুব গরম। কিন্তু বছরের বেশীর ভাগ সময় ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তরের বায়ু এসে মিসরকে বেশ খানিকটা শীতল রাখে। শীতকালে ব-দ্বীপ অঞ্চলে সামান্য কিছু বৃষ্টি হলেও, নীল নদের উপত্যকায় বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। বৃষ্টির জল ছাড়াই কিন্তু মিসরের খুব ভাল চাষ হয়।

পাহাড় গড়ানো বৃষ্টির জল, বরফ গলা আর ঝর্ণার বিপুল জলরাশি নিয়ে নীলনদ বয়ে চলে। এর ফলে নদীতে দেখা দেয় বন্যা। দু'কূল ছাপিয়ে এই বন্যার জল বিস্তীর্ণ এলাকা ভাসিয়ে দেয়। বছরের প্রায় চার মাস এই বন্যা প্রবল হয়ে ওঠে। পরে জল নেমে যায়, আর রেখে যায় পলি আর কাদা। ফলে জমি অত্যন্ত উর্বর হয়ে ওঠে। সেই উর্বর মাটিতে নদীর জলের সেচ দিয়ে চাষীরা ফসল ফলায়। এই নীল নদই যুগ যুগ ধরে মিসরের মানুষকে জুগিয়ে আসছে খাদ্য, সমৃদ্ধ করেছে নানা সম্পদে। সেইজন্য মিসরকে বলা হয় নীলনদের দান।

ফ্যারাও :—প্রথমে মিসরে নানান উপজাতি আলাদা আলাদা অঞ্চলে বাস করত। কিন্তু এইসব ছোট ছোট গোষ্ঠীর পক্ষে সেচের জলের জন্য খাল কাটা কিংবা বন্যা প্রতিরোধের জন্য বড় বড় বাঁধ বাঁধা সম্ভব ছিল না। এই তাগিদ থেকেই কালক্রমে সারা মিসরে দু'টি বড় বড় রাজ্য গড়ে ওঠে—একটি উত্তরের ব-দ্বীপ অঞ্চলে, অপরটি দক্ষিণের উপত্যকায়।

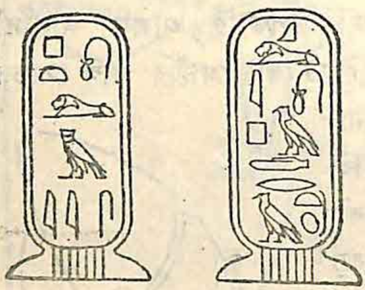

ফ্যারাও তৃতীয় থুটমিস

আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এই দুইটি রাজ্য একজন রাজার অধীনে আসে। এই ঐক্যবদ্ধ মিসরের রাজাকে বলা হত ফ্যারাও। নীলনদের পশ্চিম পাড়ে মেম্ফিসে প্রথমে ফ্যারাওদের রাজধানী স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে ফ্যারাওদের ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়। মিসরবাসীরা ফ্যারাওকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করত।

পুরোহিত :—দেশে প্রচুর শস্য উৎপাদনের ফলে অনেক মিসরীয়ের জীবনে প্রচুর অবসর মিলল। এই অবসর জীবনে তাদের মনে জাগল কোথা থেকে আকাশের বুকে এত তারা ফুটে ওঠে? বজ্রের গর্জনের পেছন কে রয়েছে? কেমন করে নীলনদে নিয়ম করে বন্যা

আসে? তাদের এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে এগিয়ে এল এক শ্রেণীর মানুষ। এদের বলা হত পুরোহিত। কালক্রমে পুরোহিতরা সমাজে উঁচু স্থান পেল। শিক্ষা-দীক্ষাতেও তারা শ্রেষ্ঠ ছিল। সমস্ত দরকারী দলিল-দস্তাবেজ তাদের কাছেই জমা থাকত। দেশের ধর্ম বিশ্বাস সৃষ্টি ও ব্যাখ্যার মূলেও ছিল এই পুরোহিত সমাজ।

লিপি ও লিপিকার : প্রাচীন মিসরীয়রা লিখতে জানত। শোলার মত এক ধরনের জলজ গাছের ডাঁটার ফালি জোড়া দিয়ে তার ওপর লিখত। রান্না ঘরে যেসব ঝুল জমে, সেই রকম ঝুল আঠায় গুলে কালি করে নিয়ে ডাঁটার কলমে তারা লিখত। সেই শোলার মত জলজ গাছের নাম ছিল প্যাপিরাস। এই প্যাপিরাস নাম থেকেই কাগজের নাম হয়েছে 'পেপার'।



মিসরীয় লিপি

প্রথম অবস্থায় মিসরীয়দের লেখার হরফগুলিতে থাকত অনেক রকমের পশুপক্ষী আর মানুষের ছবি। এইগুলিকে চিত্রলিপি বলা যায়। পরে এইসব ছবি হরফ রেখার রূপ নিল। এইসব লেখা আবার মন্দির ও সমাধির গায়েও খোদাই করা থাকত।

মিসরে লেখার কাজকর্ম খুব বেড়ে যায়; চিঠিপত্র, রাজার হুকুমনামা লেখা, হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতির প্রয়োজন দেখা দিল। দরকার পড়ল একদল লিখতে জানা অভিজ্ঞ মানুষের। এইসব লিপিকার বা লেখকরা সমাজে খুব উঁচু স্থান পেত। এদের প্রত্যেককেই খুব ভাল রকম লেখাপড়া শিখতে হত। লেখার ব্যাপারে এদের কম করে সাতশ আলাদা আলাদা চিহ্ন মনে রাখতে হত।

সৈনিক :—প্রথম দিকে ফ্যারাওদের খুব একটা যুদ্ধবিগ্রহ করতে

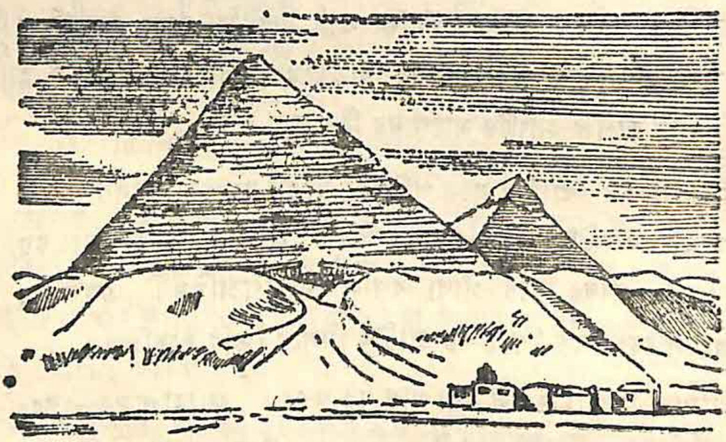
হত না। তাই যারা সৈনিক ছিল তাদের বিভিন্ন কাজে খাটতে হত। বড় বড় ইমারত তৈরি, খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা, মাল বওয়া, নৌকো জাহাজ চালান প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজ তাদের দিয়ে করানো হত। তাদের ঘিঞ্জি বস্তিতে বাস করতে হত।

ব্যবসা-বাণিজ্য :—মিসরে নানা ধরনের শিল্পদ্রব্য তৈরি হত। সুন্দর সুন্দর কাপড়, রঙ্গীন পাতলা চামড়া, আসবাবপত্র, নানা ধরনের পাত্র, প্যাপিরাস থেকে দড়ি, কাগজ প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হত। জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত ডিঙ্গী, নৌকো, দাঁড় টানা নৌকো এবং পাল তোলা বড় বড় নৌকোতে। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং উত্তরের ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলির সাথে মিসরের বাণিজ্য চলত। দক্ষিণের সুদান থেকে মিসরে আমদানি হত সোনা, আবলুস কাঠের গুঁড়ি, চিতা বাঘের চামড়া, হাতীর দাঁত প্রভৃতি। পান্ট এবং আরো পূর্বের দেশ থেকে আসত সুগন্ধি কাঠ, আঠা রঞ্জন ইত্যাদি। জিনিসপত্র কেনা বেচা হত পরস্পর বিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু পরে সোনা আর রূপোর আংটির মাপে দর ঠিক করা হত।

পিরামিড : প্রাচীন যুগে পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য জিনিস ছিল। এর মধ্যে একটিই মাত্র এখনও টিঁকে আছে। এটি মিসরের পিরামিড। পাথর দিয়ে গাঁথা বিশাল এই পিরামিড। একটি নয় অনেকগুলি ছোট বড় পিরামিড প্রাচীন মিসরে তৈরি হয়েছিল।

আসলে পিরামিড হল মরা মানুষের কবর। ফ্যারাওদের কবরগুলিতে অনেক রকমের দামী গয়নাপত্র আর প্রচুর জিনিসপত্র থাকত। ইটের কবর খুঁড়ে দামী জিনিসপত্র চুরি করা খুব সহজ ছিল। কবরগুলি যাতে চোর ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, সেই জন্যই সেগুলি পাথর দিয়ে মজবুত করে গাঁথা হত। জোসার নামে এক ফ্যারাও সাদা চুনাপাথরের গড়া ধাপওয়ালা সাক্কারার পিরামিডের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু পরে পিরামিডগুলি এমন ভাবে তৈরি হল, যাতে কোন ধাপ রাখা হত না।

সেই সুদূর অতীতে এখনকার মত যন্ত্রপাতি ছিল না। তামা থেকে তৈরী ছেনি, হাতুড়ি, তুরপুন আর করাত দিয়ে পাহাড় থেকে মাপ মত পাথরের লক্ষ লক্ষ চাঁই কাটা হত। হাজার হাজার শ্রমিক এইসব পিরামিড তৈরির কাজে নিযুক্ত হত। কয়েক বৎসর ধরে তাদের কতক লোক চুণাপাথরের খনি থেকে পাথর কাটত। আবার অনেক শ্রমিক মিলে সেইসব পাথরগুলো নৌকোতে করে বয়ে আনত। তারপর সারি সারি পাথর বসিয়ে কিছুটা গাঁথা হলে, তার ওপর রোদে শুকনো ইট কিংবা মাটির তাল বসানো হত। ঐ মাটির তাল বা ইটের ওপর আবার পাথরের গাঁথনি উঠত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পাথরের জোড়ের চিহ্ন প্রায় নেই বললেই চলে। এই বিরাট সমাধির ভেতরে ঢোকবার জন্য একটা ছোট গুপ্ত পথ রাখা হত। কেবল ফ্যারাও



খুফুর পিরামিড

বা তাদের পরিবারের লোকের জন্যই এই পিরামিড নির্মাণ হত না। ধনী বা অভিজাতরাও ছোট ছোট পিরামিড তৈরি করতেন।

ঐ সব পিরামিডগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশাল ও বিস্ময়কর খুফু নামে একজন ফ্যারাওয়ের পিরামিড। এই পিরামিড নির্মাণ করতে প্রায় তেইশ লক্ষ পাথরের চাঁই লেগেছিল। আর এই পাথরের চাঁইগুলির প্রত্যেকটির ওজন ছিল প্রায় আধ টন করে। এক লক্ষ

শ্রমিক বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে এই পিরামিড নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিল। চারশ একাশি ফুট উঁচু এই পিরামিডের নীচের চৌকো অংশটির বেড় প্রায় ১৩ একর। এই পিরামিডটিই প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি।

খুফু ছাড়াও আরো দু'জন ফ্যারাও খাফ্রে এবং মেনকোরে দুইটি বিরাট পিরামিড তৈরি করান। তবে এঁদের পিরামিডগুলি কিন্তু খুফুর পিরামিডের মত অত বিশাল ছিল না।



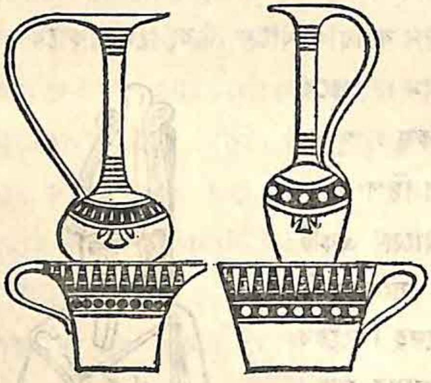
মিসরীয় দেবতা : ওসিরিস

স্ফিংক্স : ফ্যারাও খাফ্রে একটি পাহাড় কেটে এক বিরাট সিংহ মূর্তি তৈরি করান। এই মূর্তির দেহ সিংহের মত, কিন্তু মাথা ও চুল মানুষের মত। এই অদ্ভুত মূর্তিটির নাম স্ফিংক্স পরে মিসরের বহু স্থানে ছোট বড় নানা রকমের স্ফিংক্স তৈরি হয়েছিল।

ধর্ম-বিশ্বাস : প্রাচীন মিসরীয়দের মধ্যে এক অদ্ভুত ধর্ম-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে মৃতদেহ যতদিন রক্ষা করা যাবে ততদিন সেই মৃত মানুষের আত্মা স্বর্গে বাস করবে। সেই বিশ্বাসে মৃত দেহকে মমি করবার প্রথার প্রচলন হয়। নানা রকমের জিনিস মিশিয়ে এক রকম আরক তৈরি করে মৃতদেহে মাখিয়ে এক টুকরো পাতলা কাপড় দিয়ে সেটিকে জড়িয়ে রাখা হত। এই ভাবেই মৃত দেহকে বহুদিন রাখা হত। এই ধরনের অনেক মমি পৃথিবীর অনেক যাদুঘরে রাখা আছে।

মিসরীয়রা অনেক দেব-দেবীর উপাসনা করত। রী (রা) ওসিরিস ও আমন ছিলেন তাদের প্রধান দেবতা। নীলনদকেও

তারা দেবতাজ্ঞানে পুজো করত। তাদের মধ্যে আবার বেড়াল, কুকুর, ভেড়া প্রভৃতি পশুর পুজোরও চল ছিল। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পরেও মানুষ পৃথিবীর মতই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাই তারা মৃতদেহের সমাধিতে খাদ্য, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের খুঁটিনাটি জিনিসপত্র রেখে দিত। ফ্যারাওদের সমাধিতে ভাল ভাল আবলুস কাঠের, হাতীর দাঁত ও সোনার ওপরে বহু সুন্দর সুন্দর কাজ করা জিনিসপত্রও রাখা হত। আবার অনেক লেখা বইও রাখা হত। ঐ সব থেকে প্রাচীন মিসরের সমাজ-জীবনের অনেক তথ্য জানা গেছে।



ফ্যারাও তৃতীয় রামেসিসের সমাধি থেকে আবিষ্কৃত স্বর্ণপাত্র

প্রধান প্রধান উপজীবিকা : প্রাচীন মিসরীয়রা বহু কাজ কর্মে নিযুক্ত থাকত। বেশীর ভাগ লোকই চাষ-আবাদ, সেচের খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা, পিরামিড ও অন্যান্য মন্দির নির্মাণের কাজে নিযুক্ত থাকত। মন্দিরগুলির গায়ে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য বা মূর্তি খোদাই করার কাজেও একদল দক্ষ ভাস্কর নিযুক্ত থাকত। একদল লোক লিপিকারের কাজ করত। ব্যবসা-বাণিজ্যে ও রাজকার্যে লিপিকারের প্রয়োজন হত। খনিতে অনেকে কাজ করত। সিনাই-এর তামার খনি থেকে খনির শ্রমিকেরা প্রচুর তামা সংগ্রহ করত। নৌকো এবং ছোট বড় দাঁড়ে টানা এবং পাল তোলা জাহাজ তৈরির জন্য একদল লোক কাজ করত। তা ছাড়া অনেক সুদক্ষ কারিগর মাটির পাথর ও তামার পাত্র গড়ত। সেগুলির গায়ে নানান নক্সা কাটত। তাঁতী নানা রকমের অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় তৈরি করত। আবার অনেকে রঙ্গীন

কাঁচ ও সূক্ষ্ম চামড়ার কাজ করত। হাতীর দাঁত ও সোনার ওপরেও বিচিত্র সব শিল্পকাজ হত।

এই ভাবেই সেদিনের মিসর এক আশ্চর্য সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

অনুশীলনী

১। (ক) মিসরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন?

(খ) ফ্যারাও কাদের বলা হত?

(গ) পুরোহিতদের আবির্ভাব কেন ঘটল? তারা কি কাজ করত?

(ঘ) প্রাচীন মিসরীয়রা কি ভাবে লিখত? কাগজের নাম পেপার কেন হল?

(ঙ) মিসরীয় সমাজে লিপিকারের প্রয়োজন হল কেন?

(চ) পিরামিড কাকে বলা হয়? পিরামিড কেন নির্মিত হল? প্রথম অবস্থায় পিরামিডের রূপ কেমন ছিল? একটি উদাহরণ দাও।

(ছ) স্ফিংক্স কাকে বলে? সর্বপ্রথম স্ফিংক্স কে তৈরি করল?

(জ) মিসরীয়দের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে লিখ। মমি কাকে বলে? কি জন্য এবং কিভাবে মমি তৈরি করা হত? মিসরীয়রা মৃতদেহের সমাধিতে নানা রকমের জিনিস কেন রেখে দিত? মিসরীয় দেবতার দু'একটির নাম কর।

(ঝ) মিসরীয়গণ বিদেশের সঙ্গে কি সব জিনিস কেনা বেচা করত? কিভাবে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত? জিনিসপত্রের দর ঠিক করা হত কি ভাবে?

(ঞ) মিসরীয়দের প্রধান প্রধান উপজীবিকা কি ছিল?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) —প্রথমে ফ্যারাওদের রাজধানী স্থাপিত হয়। (খ) স্ফিংক্সের মাথা ও চুল ছিল—মত, দেহ ছিল—মত। (গ) মিসরীয়দের লেখার হরফ প্রথমে ছিল—মত। (ঘ) লিপিকারদের—লেখার চিহ্ন মনে রাখতে হত।

৩। ডান দিকের সারি থেকে ঠিক ঠিক উত্তর বেছে বাঁ দিকের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) মিসরের জমির উর্বরতার কারণ কি?	(ক) বৃষ্টি, বন্যার পলি, সার প্রয়োগ।
(খ) পিরামিড কি?	(খ) মন্দির, প্রাসাদ, সমাধি।
(গ) কোন্ ধাতুর যন্ত্রপাতি দিয়ে পাথর কাটা হত?	(গ) লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ।
(ঘ) কোন্ পিরামিডটি সবচেয়ে বিশাল ও বিস্ময়কর?	(ঘ খুফুর, খাফ্রার, সেনকোরের
(ঙ, মমি করা হত কি ভাবে?	(ঙ) তেলে ডুবিয়ে রেখে, আরক মাখিয়ে, এ্যাসিড লাগিয়ে।

সিন্ধু উপত্যকা

অবস্থান ও আবিষ্কারের কাহিনী :—ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদ। এই সিন্ধুনদের উপত্যকায় তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের এক নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেন্-জো-দড়োতে আর পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার হরপ্পাতে ঐ যুগের দুটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

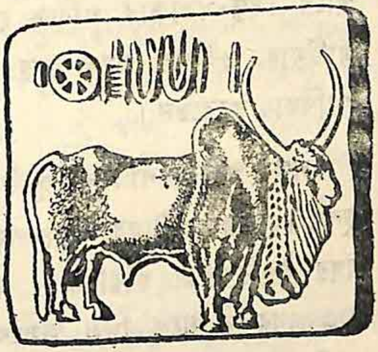


মহেন্-জো-দড়ো সিন্ধু নদের দক্ষিণ তীরে এবং হরপ্পা ইরাবতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত ছিল। ইরাবতী নদীটি সিন্ধু নদেরই একটি শাখা নদী। শুধু ইরাবতীই নয়—শতদ্রু, বিপাসা, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা—সিন্ধুনদের আরো চারটি শাখা নদী নিয়েই গড়ে উঠেছিল

পাঞ্জাব—পাঁচটি নদীর দেশ। পরে আরও অনেক জায়গায় মাটি খুঁড়ে এই সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

বেলুচিস্তান থেকে গুজরাট পর্যন্ত পাওয়া গেছে সিন্ধুসভ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। পূর্বে গঙ্গানদীর অববাহিকা থেকে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ছিল এ সভ্যতার বিস্তার। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় চল্লিশটি নগর ও গ্রামের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্পা থেকে পাওয়া যায় নরম পাথরের ওপর খোদাই করা কয়েকটি সীলমোহর। এই সীলমোহরগুলিতে ছিল কয়েকটি পশুর মূর্তি আর বিচিত্র হরফে কতক লেখা। ১৯২০ সালে দয়ারাম শাহানী হরপ্পাতে মাটি খুঁড়িয়ে কিছু কিছু পুরোনো জিনিস-পত্রের সন্ধান পান। কিন্তু এই সভ্যতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে মহেন্ জো-দড়োতে খনন কার্যের ফলে। আর এই খনন-কার্যের পরিচালনা করেন সর্বপ্রথম এক বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক—পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।



হরপ্পায় আবিষ্কৃত সীলমোহর

সিন্ধী ভাষায় মহেন্-জো দড়োর অর্থ 'মৃতের স্তূপ'। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট মাটির উঁচু এই স্তূপ বনজঙ্গলে ভরা। রাখালদাস ওরই কাছাকাছি একদিন হরিণ শিকার করতে গিয়ে এক অদ্ভুত ছুরির সন্ধান পান। ছুরিটি কিন্তু কোন ধাতুর নয়—চকমকি পাথরে তৈরী শাণিত ছুরি। রাখালদাস ছিলেন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। তিনি সহজেই অনুমান করলেন যে ইতিহাস-বিস্তৃত এক সভ্যতার নিদর্শন এখানে পাওয়া যাবে। স্তূপ খোঁড়া শুরু হল ১৯২২ সালে। একে একে মাটির তলা থেকে উঠতে লাগল নানা রকমের জিনিস। চারদিকে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল। এরপর

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান স্যার জন মার্শাল হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে কয়েক বছর ধরে খনন কার্যের ব্যবস্থা করলেন। ফলে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার ভারতের এক গৌরবময় সভ্যতার প্রচুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হল।

হরপ্পা এবং মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপ খননেই কিন্তু এই অনুসন্ধানের পালা শেষ হয়নি। ননীগোপাল মজুমদার নামে একজন পণ্ডিত খনন করে অনেক শহর ও প্রাচীন গ্রামের পরিচয় প্রকাশ করেছেন। মহেন্-জো-দড়োর ষোল মাইল দূরে তিনি ঝুকর নামক স্থানে সিন্ধু-সভ্যতার পরিচয় পেয়েছিলেন, তাঁর পরেও ম্যাকে, মার্টিমার, হুইলার প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই সভ্যতার বহু প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন।

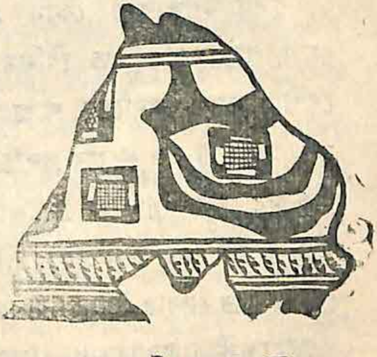
নগর পরিকল্পনা :—সিন্ধু উপত্যকার নগরগুলির পরিকল্পনা ছিল সুন্দর। নগরবাসীদের স্বাস্থ্য আর সুখ-সুবিধার কথা ভেবে এইসব নগর তৈরি করা হয়েছিল। রাজপথগুলি ছিল বেশ চওড়া আর রাজপথের দু'পাশে ছিল অসংখ্য দোকানপাট আর বসত বাড়ী। বাড়ীগুলি সব পাকা ইটের গাঁথনিতে গাঁথা। দোতলা বাড়ীও ছিল অনেক। দোতলায় ও ছাদে ওঠার সিঁড়িও ছিল। বাড়ীগুলিতে দরজা ও ছোট ছোট জানালাও ছিল। বাড়ীর ভেতরে উঠোন ছিল। পাকা ইট দিয়ে বাঁধানো গলিপথ দিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে হত। গলির পাশ দিয়ে ছিল পাকা নর্দমা। গলির নর্দমা দিয়ে জল এসে পড়ত বড় রাস্তার নর্দমাতে। ছাদের মাথায় লাগানো থাকত পোড়া মাটির নল। সেই নল বেয়ে ছাদের জল রাস্তার নর্দমায় পড়ত। ধনীদের বাড়ীতে পাকা ইটের গাঁথা পাতকুয়া ছিল। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য কূয়া ছিল প্রকাশ্য স্থলে। আর এই নগর রক্ষা করার জন্য ছিল দুর্গ।

স্নানাগার :—মহেন-জো-দড়োতে এক বিরাট ও সুন্দর স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্নানাগারটি ১৮০ ফুট লম্বা এবং

১০৮ ফুট চওড়া ছিল। এর চার দিকটা ছিল আট ফুট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে একটা বড় আঙ্গিনার মধ্যে ছিল সাঁতার কাটার জায়গা। এটি উনচল্লিশ ফুট লম্বা, তেইশ ফুট চওড়া এবং আট ফুট গভীর ছিল। আবার এই সাঁতারের জায়গাটায় জল ধরে রাখবার জন্য চারদিকে এক ইঞ্চি পুরু শিলাধাতুর প্রলেপ দিয়ে একসারি মসৃণ ইট গাঁথা ছিল।

খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিস ঃ—এখানকার লোকের খাদ্য-দ্রব্য ছিল যব, গম, তিল, মটর, রাই প্রভৃতি শস্য। তাছাড়া ভেড়া, শূয়োর, মুরগী, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস আর সমুদ্রের শামুক ও শুঁটকি মাছ তারা খেত। তারা কার্পাস সুতোর তৈরী পোশাক-পরিচ্ছদ ও পশমের শাল ব্যবহার করত। গৃহস্থালীর জন্য তামা, ব্রোঞ্জ, পাথর মাটির বাসন-পত্র, মাটির হাঁড়ি, কড়া, থালা, বাটি, নৈবদ্য পাত্র, গেলাস, শরা, মালসা, গামলা, কলসী, মটকী প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। তাদের মধ্যে চকমকি পাথরের ছুরি, পাথরের কুড়ুল, লাঙ্গলের ফলা, প্রসাধনের বাক্স, থালা, বাটি, রংদানি প্রভৃতির চলন ছিল।

হস্তশিল্প ঃ—প্রধানত ব্যবসা বাণিজ্য ও নানাধরনের হস্তশিল্পের ওপর নির্ভর করে এই নগরগুলি গড়ে উঠেছিল। খাদ্যশস্যের উৎপাদন করে গ্রামবাসী, নগরবাসীরা করে না। সেইজন্য এইসব নগরে বিভিন্ন ধরনের হস্ত-শিল্পের কাজ হত। কুমোরেরা মাটির নানা-রকমের পাত্র তৈরি করত। পোড়ামাটির পাত্রের ওপর নানা ধরনের নক্সা আঁকা থাকত। একদল শিল্পী আবার শিশুদের খেলনা তৈরি করত। গাড়ী, রথ, বাঁশি, পশু, পাখি, ঝুমঝুমি, চাকতি, মার্বেল, মাথা নাড়া পুতুল এমনি সব খেলনা পাওয়া


পোড়া মাটির পাত্রে নক্সা

গেছে। এ ছাড়া একদল শিল্পী ব্রোঞ্জ ও পাথরের জিনিসপত্রও তৈরি করত। একটি ব্রোঞ্জের তৈরী নর্তকী মূর্তি ও একটি বড় করাত পাওয়া গেছে। সোনা, রূপো, শাঁখ ও দামী পাথরের নানারকমের গয়নাও তৈরি হত। এ ছাড়া কিছু শিল্পী হাড় কিংবা হাতীর দাঁত থেকে চিরুনী, ক্ষুর প্রভৃতি তৈরি করত। তামা পাথর ও ব্রোঞ্জ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হত। তামার তৈরী মুখ দেখার দর্পণও পাওয়া গেছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য :—সিন্ধু উপত্যকার প্রধান নগর দুটি ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন খুব বেশী ছিল না। স্থলপথে নিরেট চাকাওয়ালা গরুর গাড়ীতে করে এবং উটের পিঠে চাপিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্য চলাচল করত। আফগানিস্তান, পারস্য এবং রাজস্থান থেকে আসত তামার তাল। গুজরাটের কাথিয়াবার এবং দাক্ষিণাত্য থেকে আসত বিচিত্র সব শাঁখ পারস্য এবং আফগানিস্তান থেকে রূপো, নানারঙের দামী পাথর প্রভৃতি। হস্তশিল্পীদের তৈরী পণ্যসম্ভার যেত বেলুচিস্তানের গ্রামগুলিতে। আবার সিন্ধু-উপত্যকার সঙ্গে সুদূর ক্রীট দ্বীপ ও মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্য চলত। মেসোপটেমিয়ার আক্কাদ নগরে ভারতীয় বণিকদের একটি উপনিবেশের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সিন্ধু-উপত্যকায় কোন মুদ্রার চল ছিল না। মিসর এবং মেসোপটেমিয়ার মত বিনিময়ের মাধ্যমেই জিনিস কেনা বেচা হত। বেশীর ভাগ কেনাবেচা শস্যের মাধ্যমে হত। মহেন্-জো-দড়ো এবং হরপ্পায় ছোট বড় শস্যের গুদামের সন্ধান পাওয়া গেছে। জিনিসপত্র ওজনের জন্য এখানে বাটখারার ব্যবহার ছিল। অনেক পণ্ডিত মনে করেন সিন্ধু-উপত্যকার সীলমোহরগুলি পণ্যের ওপর ছাপ দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত।

দেবদেবীর উপাসনা:—সিন্ধু উপত্যকায় মিসর বা মেসোপটেমিয়ার মত কোন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক মাটির মূর্তি। এগুলির গায়ে ছিল সিঁদুরের

মত লাল রঙের দাগ। মূর্তিগুলির গলায় ছিল কড়ির মালা। এ গুলিকে মাতৃকামূর্তি বলা হয়েছে। মনে হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দেবী-মূর্তির পুজোর খুব চলন ছিল।

মহেন্-জো-দড়োতে একটি বিচিত্র সীলমোহর পাওয়া গেছে। যোগাসনে একটি পুরুষ বসে আছেন। তার পাশে বাঘ, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি জীবজন্তু রয়েছে। এই পুরুষ মূর্তিটিকে শিবের পশুপতি রূপ বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া যোগী বা পুরোহিত মূর্তিও পাওয়া গেছে। এই মূর্তির মুখে দাড়ি, মাথায় ফিতে বাঁধা, চোখ দুটি নাসাগ্রে স্থির।



পশুপতি মূর্তি

এ ছাড়া সিন্ধু-উপত্যকায় বৃক্ষ এবং জীবজন্তুর উপাসনা প্রচলিত ছিল।

সমাজে শ্রেণী বিন্যাস :—সিন্ধু-সভ্যতা নগর সভ্যতা। নগরের মানুষদের খাবার জোগাবার জন্য নগরের চারদিকে ছিল শস্য ক্ষেত্র। সেখানে কৃষকেরা নানা ফসল ফলাত। খাদ্যশস্য ছাড়াও কার্পাসের ব্যাপক চাষ হত। কার্পাসের তুলোর পোশাক মেসোপটেমিয়া এবং অনেক দূরের দেশে রপ্তানি হত। সুতো কাটা এবং কাপড়-চোপড় বোনবার কাজে একদল শ্রমিক ও শিল্পী নিযুক্ত থাকত। সিন্ধুনদের বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উঁচু বাঁধ বাঁধবার নিদর্শন পাওয়া গেছে। শহরের বাইরে ছিল ভাটি। সেখানে শ্রমিকরা ইট গড়া এবং পোড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকত। সেই ভাটি থেকে বলদে টানা গাড়ীতে ইট আনা হত। আর সেইসব ইট বয়ে এনে হাজার হাজার মজুর বাঁধ বাঁধত। এ ছাড়া একদল শ্রমিক গম যব প্রভৃতি ঝাড়াই মাড়াই বা পেষাই করত। রাই ভেঙ্গে তেল বের করবার কাজও একদল শ্রমিক করত। আবার জেলেরা জাল দিয়ে মাছ ধরত। নগরগুলিতে শ্রমিকদের

বাসের জন্য সারি দেওয়া দু-কুঠুরী বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা সমাজে বেশী ছিল। কিন্তু হস্তশিল্পেও দক্ষ কারিগরদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। তাদের তৈরী মালপত্র নিয়ে ব্যবসায়ীরা দেশ-দেশান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

নগর রক্ষার জন্য দুর্গটি শস্যাগার ও স্নানাগারের খুব কাছেই ছিল। এই ব্যবস্থা দেখে অনেকে মনে করেন এটি ছিল ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। এই স্থানে কোন পুরোহিত-শাসকের অধিষ্ঠান ছিল। তবে সুন্দর নগর-পরিকল্পনা দেখে মনে হয় যে সিন্ধু উপত্যকায় একটি সুশৃঙ্খল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। আর দুর্গ যখন ছিল তখন সমাজের একদল মানুষ সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত।

দুর্গের পাশেই পাওয়া গেছে বড় বড় অট্টালিকা। অনেকে মনে করেন এগুলি ছিল রাজপুরুষদের বাসস্থান। বড় বড় শস্যাগার দেখে মনে করা হয় রাজ্যের কর আদায় হত শস্য থেকে। আর শস্য দিয়েই রাজ কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হত।

সীলমোহরগুলিতে গরু, ভেড়া, হাতী, উট, ষাঁড় ও ময়ূরের চিত্র অঙ্কিত ছিল। আর সেগুলির ওপর ছিল বিচিত্র সব হরফ। এর থেকে মনে হয় সমাজে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল। মেসোপটেমিয়া এবং মিসরের লিপিগুলি পড়তে পারা গেছে। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া সীলমোহরের লিপিগুলির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই সিন্ধু-সভ্যতার অনেক বিষয় আজও অজানা রয়ে গেছে। সিন্ধু-নদের প্লাবনে কিংবা বাইরের শত্রুর আক্রমণে এই নগরসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।

অনুশীলনী

১। (ক) ভারতে তাম্র-ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার নিদর্শন কোথায় পাওয়া গেছে? সিন্ধু উপত্যকায় দুটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ কোন্ কোন্ স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে?

(খ) সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারে কাহার অবদান সবচেয়ে বেশী? তিনি কোন্ স্থানটি আবিষ্কার করেন? এইসব আবিষ্কারের কাজে আরও কয়েকজন পণ্ডিতের নাম কর।

(গ) 'মৃতের স্তূপ' কাকে বলা হত? এই মৃতের স্তূপ খননের ফলে প্রধান প্রধান আবিষ্কৃত কয়েকটি বস্তু ও বিষয়ের উল্লেখ কর।

(ঘ) সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন যুগের কয়েকটি হস্তশিল্পের নাম কর। এইসব হস্তশিল্পের তৈরী কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ কর।

(ঙ) কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত? কোথায় থেকে তামার তাল আনা হত? কোন্ স্থানে সিন্ধু উপত্যকাবাসীর একটি বাণিজ্য উপনিবেশের সন্ধান পাওয়া গেছে?

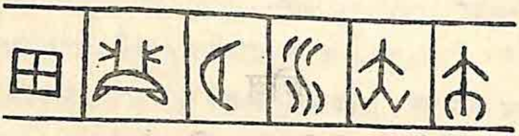
চীন

হোয়াং-হো ও ইয়াং-সিকিয়াং নদীর উপত্যকা :— চীনদেশে প্রথম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল হোয়াং-হো এবং ইয়াং-সি কিয়াং নদীর উপত্যকায়। এই নদী দুটি সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। প্রবাহ পথে নদীর প্রচুর পলিমাটি এসে জমা হত। ফলে চাষবাসের খুব সুবিধা হত। কিন্তু এদের মধ্যে হোয়াং-হো নদীটির গতিপথ প্রায়ই বদল হত। ফলে লোকের বসতি এবং চাষের জমিগুলি বন্যার জলে ডুবে যেত। আবার সেচের খালগুলিও নষ্ট হয়ে যেত। সেই কারণেই এই হোয়াং-হো নদীকে বলা হয় **চীনের দুঃখ**।

চীনের মানুষ কিন্তু নদীর এই সর্বনাশা রূপের কাছে ভয়ে চুপচাপ থাকেনি। তারা নানাভাবে সভ্যতার বনেদ গড়ে তুলেছে। ঠিক কোথা থেকে এই উপত্যকার অধিবাসীরা এসেছিল সে সম্বন্ধে ভাল করে জানা যায় না। অতীতে চীন ছিল আদিম মানুষের বাসভূমি। পিকিং মানুষদের কাহিনী থেকে সেটি সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সময়কার চীনদেশের মানুষের কথা স্পষ্ট করে জানা যায় না।

প্রাচীন যুগে চীন ঃ—চীনের প্রথম রাজবংশ ছিল সাং বংশ। এই বংশকে অনেকে আবার ঈন্ বংশ বলে থাকেন। এই বংশের রাজাদের রাজধানী বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে মাটির নীচে চাপা পড়েছিল। এই স্থানটিকে বলা হত ঈন্-এর স্তূপ। মাটি খুঁড়ে এই ধ্বংসস্তূপ বের করা হয়েছে। সেই সুদূর অতীতের ধ্বংসাবশেষ থেকে আমরা প্রাচীন চীন জাতির সমাজ জীবনের অনেক সন্ধান পেয়েছি।

এই ধ্বংসস্তূপ থেকে বের হয়েছে কচ্ছপের খোলের উপর খোদাই করা বিচিত্র লিপিমালা। সে সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল কচ্ছপের খোলায় দেবতার নির্দেশ পাওয়া যায়। এসব লেখায় আবার নানা



চীনের প্রাচীন লিপি

ধরনের ছবি আঁকা থাকত। বর্শা এবং তীরধনুক দিয়ে কুকুর, শূকর, ষাঁড় প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার শিকার করবার ছবি, ব্রোঞ্জের তৈরী জিনিসপত্র ও মাটির পাত্র পাওয়া গেছে। তখনকার চীনবাসীরা অনেক দেবদেবীর উপাসনা করত। তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদেরও পুজা করত। চীনের অধিবাসীরা কাঠি দিয়ে ভাত খায়। ঈং বংশের এক রাজা এই রীতি চালু করেন।

অন্যান্য নদী-মাতৃক সভ্যতার মত চীন সভ্যতা নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। চীন সমাজের সকলের ওপরে ছিলেন রাজা। তাঁর নীচে ছিলেন কিছু সংখ্যক অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। রাজা এদের মধ্যে জমি বিলি করতেন। পরিবর্তে অভিজাত শ্রেণী রাজাকে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করত। সমাজে ব্যবসায়ী এবং কারিগর শ্রেণীদেরও বিশেষ স্থান ছিল। কিন্তু চীনবাসীর অধিকাংশই ছিল কৃষক। সাং রাজারা যুদ্ধে অনেক বন্দী নিয়ে আসতেন। ক্রীতদাস রূপে সমাজের সকলের নীচে এই বন্দীদের স্থান ছিল। সাং রাজারা যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য

সেনাবাহিনী রাখতেন। চীনা সেনারা মাথায় ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ এবং শরীরে ধাতুর তৈরী বর্ম পরিধান করত।

কৃষি ছিল সাংদের প্রধান উপজীবিকা। তারা ভুট্টা, গম এবং ধানের চাষ করত। তাদের এক উন্নত সেচ ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন কাল থেকেই চীনারা সুতীর বস্ত্র পরত। সাং বংশের সময়ে রেশমের প্রচলনের কথা জানা যায়। এই সময়ই চীনে গুটি-পোকার চাষ শুরু হয় এবং রেশমশিল্প চীনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পরূপে গড়ে ওঠে। চীনারা সুন্দর সুন্দর পাত্র তৈরি করতে পারত এবং পাত্রগুলি ঘসে মেজে চকৃচকে করে তুলতে জানত। তারা 'চীনামাটির' বাসন-পত্র তৈরি করাও শিখেছিল। তারা ধাতু দিয়ে নির্মিত ফুলদানী এবং অন্যান্য পাত্রের উপর সুন্দর সুন্দর নক্সা কাটত। সাং রাজাদের সময় চীনারা ছবির হরফে লিখতে পারত। তারা রেশম কাপড়ের উপর কিংবা চিল্‌তে বাঁশের উপর তুলি দিয়ে লিখত। কালক্রমে সাং সভ্যতার কৃতিত্ব চীনের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসার লাভ করে।

চীনের উপকথা :—মিসর বা ভারতের মত চীনাদের মধ্যেও উপকথার খুব আদর ছিল। পান-কু নামে চীনাদের এক আদি পুরুষ নাকি আঠার হাজার বছর বেঁচে ছিলেন। ইনিই চীনের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ও গাছপালার স্রষ্টা। তাঁর নিঃশ্বাস থেকে বাতাস আর মেঘ, হাড় থেকে বিভিন্ন ধাতু, মাংস থেকে মাটি, চুল থেকে গাছ-পালা, শিরা থেকে নদ-নদী এবং গায়ের উকুন থেকে নাকি মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

চীনদেশের উপকথায় পাঁচজন রাজার উল্লেখ আছে। এই রাজারা চীনাদের সঙ্গীতশিল্প, চিত্রশিল্প, রেশমের বয়নশিল্প, মাছ শিকার করবার কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন। এক প্রাচীন রাজা চীনাদের দিয়েছিলেন চুম্বক। এই রাজাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল শান্। তিনি হোয়াং-হোর বন্যা প্রতিরোধ করেছিলেন। তাঁর

'উ' নামে একজন কর্মচারী ছিলেন। ইনি নয়টি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি নয়টি পাহাড় কেটে ঐ নয়টি নদীর বন্যার জল জমিয়ে নয়টি সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন।

অনুশীলনী

১। চীনের কোন্ নদীকে চীনের দুঃখ' বলা হয়? কেন বলা হয়?

২। চীনের প্রথম রাজবংশের নাম কি? এই রাজবংশের ধ্বংসস্তূপকে কি বলা হয়? এই ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া কয়েকটি বস্তুর নাম লিখ।

৩। প্রাচীন চীনাদের প্রধান উপজীবিকা কি ছিল? চীনারা কি ধরনের বস্ত্র তৈরি করত? তাদের পাত্রগুলি কি রকমের ছিল?

৪। চীনাদের লেখার হরফ কি রকম ছিল? তারা কিভাবে লিখত?

৫। চীন দেশের উপকথা থেকে বন্যা সম্বন্ধে কি জানা যায়?

নদী-মাতৃক সভ্যতাগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

মেসোপোটেমিয়া, মিসর, ভারত এবং চীন—এই চারটি সভ্যতার বিবরণ থেকে আমরা সভ্য মানুষের জীবনযাত্রার প্রথম পরিচয় পাই। প্রত্যেক সভ্যতাই নিজস্ব পথে গড়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও কিন্তু তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবন—আজ থেকে পাঁচ-ছ হাজার বছর আগে টাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিস, নীল নদ, সিন্ধু নদ এবং হোয়াং-হো নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের নিজেদের দরকারের বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে হয়। নব্য প্রস্তর যুগের প্রথম অবস্থায় এটি সম্ভব ছিল না। চাষের জন্য লাঙলের ব্যবহার এবং সেচ ব্যবস্থার ফলে অনেকটা জায়গা জুড়ে ফসল ফলানো সম্ভব হল। এই সেচ ব্যবস্থার তাগিদে সভ্যতার বৃদ্ধি ঘটেছিল। কারণ নদীর পাশের জমি থেকে জঙ্গল সাফ করে চাষের উপযোগী করতে হয়েছিল। আবার খাল কেটে জলা জমির জল বের করে দিতে হত। জনবসতিগুলি বন্যার হাত থেকে রক্ষা

করার জন্য বাঁধের ব্যবস্থা করা হত। এইসব কাজের জন্য একটা বড় রকমের সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দিল। ছোট একটি গ্রামের পক্ষে এ কাজ সম্ভব ছিল না। সেই কারণেই সেখানে নগর গড়ে উঠল। এই নগরগুলিতে একসাথে অনেকে বাস করত এবং একটি শাসনব্যবস্থাও চালু হল। কৃষির ফলন অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় অনেক মানুষ খাদ্য উৎপাদনের কাজ থেকে মুক্ত হল। তারা নগরে বাস করে নানা ধরনের হাতের কাজে দক্ষ কারিগর হয়ে উঠল।

নগররাষ্ট্রের উদ্ভব :— নগররাষ্ট্র এই সভ্যতাগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রগুলির রূপ এখনকার মত না হলেও সেখানে এক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। প্রথম দিকে এই রাষ্ট্রগুলি ছিল খুব ছোট, কালক্রমে তাদের প্রসার ঘটে। সাধারণত রাজা রাষ্ট্রগুলি শাসন করতেন, তাঁদের রাজকার্যে সাহায্য করত কিছু সংখ্যক কর্মচারী। দেশের ভেতরকার শান্তিরক্ষা ও বাইরের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য একটি সেনাদল থাকত। ধাতুর ব্যবহারে নতুন নতুন ও উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের প্রচলন ঘটে।

সমাজে বৈষম্য :—কৃষিকাজ শেখবার প্রথম অবস্থায় মানুষের খাদ্যের খুব অভাব হত না। ঐ সময় মানুষের সাথে মানুষের অবস্থার খুব বেশী পার্থক্য ছিল না, প্রায় প্রত্যেকেই কম-বেশী একই ধরনের কাজ করত এবং একই ভাবে বসবাস করত। কিন্তু সভ্যতার আবির্ভাবে সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজ করত। তাদের জীবনযাত্রার ধরন-ধারণও আলাদা রকমের ছিল। সমাজে কোন কোন শ্রেণী বেশী সুযোগ পেত, আর বেশীর ভাগ শ্রেণীর ভাগ্যে কম সুযোগ জুটত। বেশীর ভাগ মানুষই ছিল কৃষক এবং কারিগর শ্রেণীর। তাছাড়া রাজারা যুদ্ধ জয় করে অনেক বন্দীকে নিজেদের দেশে ক্রীতদাস করে রাখত। এই সমস্ত শ্রেণীর মানুষই সমস্ত খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় সকল জিনিস তৈরি করত। কিন্তু এসবের বেশীর ভাগই আত্মসাৎ করত শাসক,

পুরোহিত এবং রাজকর্মচারীর দল ; তারা তাদের পরিশ্রমের ফসল এবং জিনিসপত্র অতি সামান্যই ভোগ করতে পারত।

এইসব নগর সভ্যতার রাজারা বাইরের শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে একটি করে সেনাবাহিনী পুষত। এই সেনাবাহিনী আবার দেশের মধ্যে দরিদ্র মানুষের অসন্তোষকে দাবিয়ে রাখত। সমাজের শাসক, বড় বড় ব্যবসায়ী এবং কর্মচারীদের জন্য ছিল বড় বড় অট্টালিকা। আর কৃষক শ্রমিকরা বাস করত ঘিঞ্জি বস্তিতে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে শ্রম বিভাগেরও সৃষ্টি হয়েছিল। ফসল ফলাবার কাজ থেকে মুক্ত হয়ে অনেকে নানা ধরনের শিল্প এবং হাতের কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। দক্ষ কারিগরদের জন্য প্রয়োজন ছিল ভাল রকমের হাতে কলমে শিক্ষা দানের। এইভাবে এই সবকটি সভ্যতায় নানা ধরনের বহুমুখী শিল্পকাজ গড়ে উঠেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য :—এই সভ্যতাগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল দেশের ভিতরে এবং অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন। এই ব্যবসা-বাণিজ্য এই সভ্যতাগুলি বিকাশের পথে অনেক সাহায্য করেছিল। কারণ কোন সভ্যতার পক্ষেই এককভাবে প্রয়োজনীয় সবরকমের জিনিসপত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। প্রথম অবস্থায় জিনিস-পত্র কেনা-বেচার জন্য কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না। বিনিময়ের মাধ্যমে জিনিসপত্রের আদান-প্রদান চলত। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে ক্রমে ক্রমে বিনিময় প্রথার স্থানে মুদ্রার প্রচলন ঘটে। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণেই জল বা স্থলপথে যাতায়াতের উন্নতি ঘটেছিল।

সাংস্কৃতিক জীবন :—এই নদী-মাতৃক সভ্যতাগুলির আবির্ভাবের ফলে মানুষের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা রহস্যের উদ্ঘাটন হতে থাকে। প্রত্যেক সভ্যতারই গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অন্যান্য বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। প্রত্যেকটি সভ্যতার লিপির প্রচলন মানুষের জ্ঞানের সীমা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। নতুন

নতুন চিন্তাধারা নানা ধরনের হরফে লিখে রাখা যেত। এটি পূর্বে সম্ভব ছিল না। এই লিপিগুলি থেকেই আমরা এই সভ্যতাগুলির অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। আবার এই সভ্যতাগুলিতেই ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা এক নতুন পথ গ্রহণ করেছে।

এইসব নদী-মাতৃক সভ্যতাগুলিতে গড়ে উঠেছিল মানুষের নানা ধরনের চিন্তা ও ধ্যানধারনা। এগুলি কিন্তু একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এগুলি বিভিন্ন সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে যেমন জিনিসপত্রের আদান-প্রদান হত, তেমনি আবার মানুষের চিন্তা ভাবনা ও ধ্যান ধারণাও বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। এই সবের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতার এক শক্ত ভিত। পরবর্তী কালের সভ্যতাগুলি এই ভিতের উপরই গড়ে উঠেছিল।

অনুশীলনী

১। নদী-মাতৃক সভ্যতাগুলি কোথায় কোথায় গড়ে উঠেছিল ?

২। নদী-মাতৃক দেশগুলিতে কেন নগর সভ্যতার সৃষ্টি হল ?

৩। নগর রাষ্ট্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লিখ।

৪। সমাজে বৈষম্য কেমন ছিল ? বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা কি রকম ছিল ?

৫। নদী-মাতৃক সভ্যতাগুলির সাংস্কৃতিক জীবনের বিবরণ লিখ।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

(ক) জনবসতিগুলি—হাত থেকে রক্ষা করার জন্য—ব্যবস্থা করতে হত।

(খ) সভ্যতার আবির্ভাবে সমাজে—উদ্ভব ঘটল।

(গ) বেশীর ভাগ মানুষই ছিল—এবং—শ্রেণীর।

(ঘ) সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে — — সৃষ্টি হয়েছিল।

(ঙ) প্রত্যেক সভ্যতারই —, — বা অন্যান্য বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহযুগের সমাজ

লৌহ আবিষ্কার ঃ—বিভিন্ন ধরনের পাথর এবং ধাতুর ওপর ভিত্তি করে ইতিহাসের এক একটি যুগকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নদী-মাতৃক সভ্যতাগুলিতে তামা এবং ব্রোঞ্জের বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। এরপর মানুষ আবিষ্কার করল এক নতুন ধাতু— লৌহ। লৌহ তামা বা ব্রোঞ্জের চেয়ে অনেক শক্ত ধাতু। এটি আবার অনেক সস্তা এবং সহজেই বেশী পরিমাণে পাওয়া যেত। তামা কিন্তু সহজে পাওয়া যেত না এবং মাত্র সামান্য কয়েকটি জায়গায় এর খোঁজ মিলত।

লৌহের ব্যবহার ঃ—লৌহ আবিষ্কারের ফলে চাষবাসের যন্ত্রপাতির অনেক উন্নতি হয়। লাঙ্গলের ফলা, কাস্তে, খন্তা, কোদাল প্রভৃতি প্রচুর পরিবাণে তৈরি হতে থাকে। লোহার তৈরী কুড়ুল দিয়ে বড় বড় গাছ কেটে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে বহু অনাবাদী জমিতে চাষবাস শুরু হল। লোহার ব্যবহার নানা ধরনের হাতের কাজের বিকাশেও অনেক সাহায্য করল। ফলে হস্তশিল্পের বহুল প্রসার ঘটে। মাটি খুঁড়ে এই যুগের লোহার তৈরী হাতুড়ি, নেহাই, চিমটা, পেরেক, বাটালি, করাত, কুড়ুল প্রভৃতি অনেক জিনিস পাওয়া গেছে। তাছাড়া লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্রগুলি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ধারাল। ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহে লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে কয়েকটি মানবগোষ্ঠী লোহার ব্যবহার শিখেছিল। লোহা গালিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করবার কৌশল আরও অনেক পরে মানুষ আয়ত্ত করে। লোহা গালিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করবার পদ্ধতি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে হিটাইট নামে এক জাতের মানুষ। এরা বাস করত এশিয়া মাইনর (বর্তমান তুরস্ক) অঞ্চলে। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় বারশ বছর আগে এই লৌহযুগের শুরু বলা হয়ে থাকে। এই সময় থেকেই

লোহার তৈরী জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বর্তমানের প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ ও গ্রীসদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। ভারতবর্ষে খ্রীঃ পূঃ এক হাজার সালে লৌহের প্রচলন ঘটে।

লৌহ আবিষ্কারের প্রভাব :—লোহার আবিষ্কার এবং ব্যবহারের ফলে সভ্যতার দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। কারণ এই সময় পৃথিবীর নতুন নতুন অঞ্চলে চাষবাসের কাজ শুরু হয়। নতুন নতুন নগরী গড়ে ওঠে। এইসব নগরীর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও দ্রুত প্রসার ঘটে। স্থল ও জলপথে মানুষের যাতায়াত বেড়ে যায়। ফলে যান-বাহনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। এই যুগেই দ্রুতগামী জন্তু ঘোড়ার প্রচলন হয়। ছোট বড় নানা ধরনের দাঁড় টানা এবং পাল তোলা জাহাজও তৈরি হতে থাকে। তাম্র-ব্রোঞ্জযুগে ব্যবসা-বাণিজ্য জিনিস-পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে চলত। লৌহযুগে অনেকস্থানে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। ফলে সহজেই দেশ-দেশান্তরে জিনিসপত্রের আদান প্রদান ঘটে।

সমাজ-জীবন :—নদীমাতৃক সভ্যতায় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এই সব শ্রেণীর জীবনযাত্রার মধ্যে গভীর পার্থক্য ছিল। লৌহযুগে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এই পার্থক্য আরও তীব্র হয়ে ওঠে। যারা খেতে খামারে বা হাতের কাজ করে ফসল ফলাত বা নানা ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করত, তারাই ছিল সমাজের সবচেয়ে নীচু তলায়। তাদের উৎপন্ন শস্য বা জিনিসপত্র বেশীর ভাগই আত্মসাৎ করত শাসক শ্রেণী। এই সময় অনেক অঞ্চলে যুদ্ধে বন্দী মানুষ ক্রীতদাসের জীবনযাপন করত। তাদের অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের কাজে লাগান হত। আবার ভারতবর্ষের মত দেশে সমাজ কতকগুলি বর্ণে বিভক্ত ছিল। রাজা, অভিজাত বা অন্যান্য শ্রেণী, যারা পরিশ্রম করত না তারা বাস করত বড় বড় প্রাসাদে বিলাস আর আড়ম্বরের মধ্যে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষকেই অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হত।

রাজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি :—তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে রাজারা ছোট ছোট অঞ্চলের ওপর প্রভুত্ব করতেন। কিন্তু লৌহযুগে রাজাদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করে সৈন্যবাহিনী থাকত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। লোহার তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, লোহার বর্ম আর শিরস্ত্রাণ এবং দ্রুতগামী অশ্বের ব্যবহার প্রভৃতির প্রচলনে যুদ্ধবিগ্রহের প্রসার ঘটে। ফলে অনেক স্থানে রাজারা বিরাট বিরাট সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বড় বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

অনুশীলনী

১। (ক) লৌহ আবিষ্কারের ফলে মানব সমাজের কি কি সুবিধা হল ?

(খ) লৌহ আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতার কি ভাবে দ্রুত প্রসার ঘটে ?

(গ) লৌহযুগে সমাজে কি কি পরিবর্তন দেখা যায় ?

(ঘ) লৌহযুগে কি ভাবে রাজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ?

২। ডান দিকের সারি থেকে সঠিক শব্দটি দিয়ে বাঁদিকে শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) লোহা গলিয়ে জিনিস-পত্র আবিষ্কারে পদ্ধতি —— প্রথমে আবিষ্কার করে।	হিটাইটরা, সুমেরীয়রা, মিসরীয়রা।
(খ) লৌহযুগে অনেক স্থানে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল——।	মুদ্রা, কড়ি, বাটখারা।
(গ) লৌহযুগে বহুস্থানে যুদ্ধ-বন্দী মানুষ——জীবন যাপন করত।	স্বাধীনভাবে, ক্রীতদাসের, বিলাসের।

(১) ব্যাবিলন

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার অব্দে সিরিয়া থেকে আগত এক সেমিটিক জাতি ব্যাবিলন নগর স্থাপন করে। মেসোপটেমিয়ায় সুমেরের উত্তরদিকে আর একটি বড় রাজ্য ছিল। তার নাম আক্কাদ।

সুমের এবং আক্কাদে অনেকগুলি নগররাষ্ট্র ছিল। কয়েকশ বছর ধরে আক্কাদ আর সুমেরের নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে রেষারেষি আর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। এই সুযোগে ব্যাবিলনের রাজারা আক্কাদ এবং সুমের জয় করে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করে।

এই নতুন রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন হামুরাবি। ব্যাবিলন নামের অর্থ—ভগবানের দ্বার। এই ব্যাবিলন নগরীটি ছিল ইউফ্রেটিস নদীর একটি শাখার তীরে অবস্থিত। হামুরাবি গোটা মেসোপটেমিয়া এবং আশপাশের বেশ কিছু অঞ্চল জয় করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। কিন্তু এ রাজ্য খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। ক্যাসাইট এবং পরে আসিরীয়দের প্রভুত্ব সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। আসিরীয়রা ব্যাবিলন নগরী ধ্বংস করে।

খ্রীষ্টপূর্ব ছয়শ পঁচিশ সালে ব্যাবিলনে এক নতুন সম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। এই সাম্রাজ্যের বিখ্যাত রাজা দ্বিতীয় নেব্যুকাড্‌নেজারের সময় ব্যাবিলন সাম্রাজ্য পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এবং আর্মেনিয়ার পাহাড় থেকে মিসরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই নতুন সাম্রাজ্যও কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। মাত্র একশ বছরের মধ্যে পারসিকরা এই নগরী জয় করে। এর ফলে ব্যাবিলন সম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেটি ছিল প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতারই একটি পরিণত রূপ। চাষবাস, হাতের কাজ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে এখানকার অধিবাসীরা অনেক বেশী দক্ষতা অর্জন করে। রাজারা ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা বেল-মাডু‌কের নামে রাজ্যশাসন করতেন। ধর্মের ক্ষেত্রে পুরাণো সুমেরীয় ধর্মবিশ্বাস, পুরোহিত সংগঠন ও সাহিত্য অনুসরণ করা হত। সুমেরীয় রীতিতেই মন্দির এবং বড় বড় প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল। ভাষা আলাদা হলেও ব্যাবিলনের লোকেরা গোঁজের মত সুমেরীয় হরফে মাটির থালায় লিখত।

কৃষি ও বাণিজ্য :—ব্যাবিলনে খুব ফসল ফলত। চাষবাস ছিল ব্যাবিলনের লোকদের প্রধান উপজীবিকা। যাতে সব সময় চাষের জল পাওয়া যায় তার জন্য অনেক খাল কেটে বড় বড় জলাধারে জল ধরে রাখা হত। বলদে টানা লাঙ্গল দিয়ে জমির চাষ হত। সেচের দিকে রাজাদের দৃষ্টি থাকত। প্রথম রাজবংশের রাজারা প্রায় প্রত্যেকেই সেচের খাল কাটিয়েছিলেন। হামুরাবির সময় চাষবাস যাতে ভাল-ভাবে চলে এবং সেচ-খালের ভাল ব্যবস্থা হয় তার জন্য কতকগুলি বিশেষ আইন ছিল। সম্রাট নেব্যুকাডনেজারের সময় খাল কেটে ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রীস নদী যুক্ত করা হয়।

ব্যাবিলনবাসীরা দেশ ভ্রমণ করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। তাদের জাহাজ ইউফ্রেটিস নদীপথে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত চলত। সেখান থেকে আরব এবং ভারতবর্ষ হয়ে নানা ধরনের পণ্য বোঝাই করে ফিরে আসত। স্থলপথে ভারবাহী শত শত পশুরা পিঠে নানা রকমের পণ্য নিয়ে উত্তরে এশিয়া মাইনর,পশ্চিমে সিরিয়া এবং পূর্বদিকে পারস্যের পথে পাড়ি দিত। বিদেশে পাঠানো এই সব পণ্যের মধ্যে ছিল যব, কাঠ এবং নানা ধরনের কাপড়-চোপড়। চামড়া দিয়ে মোড়া কাঠের পাটাতন করে আর্মেনিয়া থেকে খনিজ দ্রব্য ভাসিয়ে নিয়ে আসা হত।

মন্দির ও পুরোহিত :— ব্যাবিলনে পুরোহিতের স্থান ছিল অত্যন্ত উঁচুতে। তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিটি ধর্মকর্ম ও উৎসব পরিচালনা করতেন। তাঁরা লেখাপড়ার চর্চা করতেন। মন্দিরের বিষয় সম্পত্তি ও টাকা পয়সার হিসেব রাখতেন। মানুষের অসুখ বিসুখে নানা রকমের তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক করতেন। প্রয়োজনে আবার ওষুধ-পত্র দিয়েও চিকিৎসা করতেন। তাঁরা দেশের আইন কানুন ভাল রকম জানতেন। মন্দিরের ছাদ থেকে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতিষ চর্চাও করতেন।

ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা ছিলেন বেল মার্ডুক। রাজা হবার

আগে এই দেবতার হাত ছুঁতে হত। অন্য দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আকাশের দেবতা আনু, পৃথিবীর ও শস্যের দেবতা এনসিল এবং ভালবাসা ও মাতৃকা দেবী ইস্টার প্রভৃতি। মন্দিরগুলির আকৃতি ছিল সুমেরীয়দের মত উঁচু গম্বুজ। নেব্যুকাড্‌নেজারের তৈরী আটটি তোরণের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর তোরণটি ইস্টার দেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এর ওপরে ছিল গম্বুজ। ব্যাবিলন নগরীর ঠিক মাঝখানে ছিল মার্ডুকের মন্দির। এর বিশাল গম্বুজ বা জিগগুরাতটি ছিল চোখ ধাঁধনো। এর সাত তলার সবচেয়ে উঁচু তলায় ছিল মূল মন্দির।

ব্যাবিলনের সমাজ জীবনে মর্ন্দিরের প্রভাব ছিল গভীর। মন্দির-গুলি ছিল শস্য ভাণ্ডার এবং নানা ধরনের পণ্যের গুদাম। আবার এই মন্দিরই ছিল বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার স্থান।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ—ব্যাবিলনে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। মন্দিরগুলি ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। নিপারের মন্দির-গ্রন্থাগার এবং আসিরীয় সম্রাট আশুরবানিপালের গ্রন্থাগার ব্যাবিলনের সাহিত্য-ভাণ্ডার। ব্যাবিলনের সাহিত্যে রাজপুত্র গিলগামেশের কাহিনী বিখ্যাত। বারটি ফলকে ত্রিশ হাজার ছত্রে এই মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল। ব্যাবিলনের সাহিত্য, আইন, ধর্মীয় আচার আচরণ, জাদুবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল।

শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ব্যাবিলন অত্যন্ত উন্নত ছিল। হামুরাবির যুগের শিল্পকীর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু নেব্যুকাড্‌নেজারের রাজ-প্রাসাদটি ব্যাবিলনের শিল্পকীর্তির একটি সুন্দর নিদর্শন। এই সম্রাটের উৎসবপথের দুই পাশেই মিসরের অনুকরণে তৈরী দুই সারি সিংহ ছিল প্রধান আকর্ষণ। রাজপ্রাসাদের এক পাশে ধাপে ধাপে তৈরী ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানটি প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি। মার্ডুকের মন্দির, ইস্টার তোরণ প্রভৃতি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। শিল কাটাই এবং তার ওপর ছিদ্র খোদাই করার কাজে ব্যাবিলনে অনেক

দক্ষ কারিগর ছিল। নিপ্পারের হাতীর দাঁতের তৈরী বিখ্যাত ষাঁড়ের মাথা ব্যাবিলনীয় শিল্পীদের এক অমর কীর্তি।

ব্যাবিলনে জ্যোতিষ, অঙ্ক-শাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চা ছিল। সূর্য, চন্দ্র এবং কয়েকটি গ্রহ সম্বন্ধে ব্যাবিলীনীয়রা অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিল। সেখানে জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ি দিয়ে সময় ঠিক করার চল ছিল। বারমাসে এক বছর, চার সপ্তাহে মাস, বার ঘণ্টায় দিন, এবং ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা এ সবই ব্যাবিলনীয় সভ্যতার দান।

হামুরাবির আইন :—পাথরের ওপরে লেখা হামুরাবির আইনের সার সংগ্রহ ব্যাবিলনীয়দের সবচেয়ে পুরোণো দলিল। পাথরটির ওপর দিকে একটি খোদাই করা ছবিতে সূর্যদেব শামাশের সামনে হামুরাবি দাঁড়িয়ে আছেন। দেবতা তাঁকে লিখিত আইন দান করছেন।



দেবতার কাছ থেকে হামুরাবির আইন লাভ

হামুরাবির আইনের মূল কথা ছিল—চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। অর্থাৎ অপরাধী যে ধরনের অপরাধ করবে, ঠিক সেই ধরনের দণ্ডই তাকে ভোগ করতে হবে।

হামুরাবির আইন থেকে তখনকার সমাজের অবস্থার অনেক কথা জানা যায়। সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—ধনী, গরীব এবং

ক্রীতদাস। সবাইকে আইন মেনে চলতে হত। শাস্তির ব্যাপারে কিন্তু বৈষম্য ছিল। উঁচু শ্রেণীর বিরুদ্ধে যখন নীচু শ্রেণীর কেউ অপরাধ করত, তখন সেখানে শাস্তির মাত্রা ছিল বেশী। আবার গরীব বা ক্রীতদাসের ওপর ধনীদের কেউ অপরাধ করলে সেখানে শাস্তির মাত্রা ছিল কম। সমাজে নারীদের অনেকখানি স্বাধীনতা ছিল। সরকারী বা বে-সরকারী সব রকম চুক্তিই লিপিবদ্ধ করতে হত। দেনা করে যারা ধার শোধ করতে পারত না, তারা ক্রীতদাসে পরিণত হত। পিতা পুত্রকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রী করতে পারত। রাজা, পুরোহিত ও রাজকর্মচারী ধনীদের চেয়েও অনেক বেশী সুবিধা ভোগ করত।

সাম্রাজ্যের পথে মিসর

এখন থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে সারা মিসর জুড়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজ্যের পত্তন হয়। এর পরে মিসরে আরও দুটি রাজ্য স্থাপিত হয়। মাঝখানে মধ্য এশিয়া থেকে হিক্সস্ নামে এক জাতের মানুষ মিসরের ভেতরকার গোলযোগের সুযোগে কিছু দিন মিসরে রাজত্ব করে। এই হিক্সস্‌রাই মিসরে সর্বপ্রথম ঘোড়া এবং যুদ্ধ-রথের প্রচলন করে।

হিক্সস্‌রা কিন্তু বেশী দিন মিসরে রাজত্ব করতে পারেনি। থিবসের এক রাজার নেতৃত্বে মিসরীয়রা হিক্সস্‌দের বিতাড়িত করে। থিবস্‌কে কেন্দ্র করে এক রাজবংশ সমগ্র মিসরে এক নতুন রাজ্যের পত্তন করে।

এতকাল মিসরীয়রা যুদ্ধবিগ্রহে বেশী পটু ছিল না। তারা এবার যুদ্ধে ঘোড়া আর ঘোড়ায় টানা হালকা যুদ্ধ-রথের ব্যবহার শুরু করল। বিদেশ থেকে বাছাই করা যুদ্ধ কুশলীদের নিয়ে এক বিরাট সেনা-বাহিনী তৈরি হল। নতুন রাজবংশের ফ্যারাওরা নীল নদের উপত্যকা এবং ব-দ্বীপ অঞ্চল ছাড়িয়ে নতুন নতুন দেশ জয় করতে

লাগল। এই সময় আবার এক নৌবাহিনীরও সৃষ্টি হল। মিসরের যুদ্ধ জাহাজ ভূমধ্যসাগরের-পূর্বতীর পর্যন্ত মিসরের প্রভুত্ব বিস্তার করল। এই নতুন রাজবংশের রাজত্বকালকে বলা হয় **সাম্রাজ্যের যুগ**।

রাজ্য জয় ও উপনিবেশ স্থাপন :—মিসরীয় সৈন্যরা এশিয়া মহাদেশের প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি দখল করে। বিজয়ী মিসরী-বাহিনী ইউফ্রেটিস নদীর তীরে উপস্থিত হয়। এইভাবে মেসোপটেমিয়ার উপত্যকায় তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ধরে এশিয়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মিসরের প্রভুত্ব বজায় থাকে। মিসর প্রাচীন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়।

ফ্যারাও প্রথম থুটমিস্ মিসরে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। তৃতীয় থুটমিসের সময় পশ্চিম এশিয়ার অনেকটা অঞ্চল এবং ইজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে মিসরের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। তৃতীয় আমেন-হোটেপের রাজত্বে এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিশরের রাজকোষে প্রচুর ধন সম্পদ জমা হতে থাকে। ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেশিস হিটাইট নামে এক দুর্ধর্ষ জাতিকে এক যুদ্ধে পরাজিত করে।

সাম্রাজ্যের যুগে ফ্যারাওরা কেবলমাত্র দেশ জয় করে বা কর আদায় করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিজিত দেশের হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে মিসরে আনা হত। এইসব বন্দীরা ক্রীতদাসের জীবন যাপন করত। খেতে খামারে, বড় বড় মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি নানা কাজে তাদের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হত। আবার বিজিত অঞ্চলগুলিতে একদল মিসরীয় সৈন্য মোতায়েন থাকত। সেইসব স্থান থেকে মিসরের শিল্পকাজের জন্য নানা রকমের কাঁচামাল নিয়ে আসা হত। মিসর থেকে অনেক ব্যবসায়ী সেইসব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তাছাড়া, প্রতিটি এলাকায় ফ্যারাওয়ের প্রতিনিধিরূপে একজন মিসরীয় প্রতিনিধি থাকতেন। আবার তাঁকে শাসন কাজে সাহায্য

করবার জন্য অনেক মিসরীয় রাজকর্মচারী ও লিপিকার বসবাস করত। এইভাবে বিজিত দেশগুলিতে মিসরের উপনিবেশ গড়ে উঠল।

সাম্রাজ্যের যুগে ফ্যারাওরা ব্যাবিলন, আসুর এবং এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এর ফলে মিসরের ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কারণাক এবং আবু-সিম্বেল প্রভৃতি স্থানে নানা রকমের কারুকার্য করা বিরাট মন্দির ও মূর্তি নির্মিত হয়। পাহাড়ের মধ্যে আবার এই যুগে ফ্যারওদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমাধিও রচিত হয়। এছাড়া সাম্রাজ্যের যুগে মিসরীয় শিল্পীরা নক্সা কাটা এবং রং করা নানা রকমের সুন্দর সুন্দর পাত্র নির্মাণ করে।

পুরোহিতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি : প্রথম থেকেই মিসরীয় সমাজে পুরোহিতদের উঁচু স্থান ছিল। ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল কাজে পুরোহিতরাই ছিল প্রধান। দেব-মন্দিরগুলি ছিল তাদের আস্তানা। এই মন্দিরগুলির নামে প্রচুর জমি আর ধন-সম্পদ জমা পড়ত। আবার মন্দিরের অধীনে অনেক হস্তশিল্পী নানা রকমের হাতের কাজ করত।

ফ্যারাওদের স্থান পুরোহিতদের থেকে আরও উঁচুতে ছিল। মিসরীয়রা ফ্যারাওকে ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করত। সাম্রাজ্যের যুগে কিন্তু পুরোহিতদের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

থিব্‌সের প্রধান দেবতা ছিলেন আমন। এই যুগে তিনি হয়ে উঠলেন সমগ্র জাতির দেবতা। প্রতিটি যুদ্ধ জয় তাঁর অনুগ্রহ বলে মনে করা হত। যুদ্ধবন্দী এবং বিজিত দেশগুলি থেকে আনা ধন-সম্পদের বেশীর ভাগই আমন দেবতার পুরোহিতদের দেওয়া হত। সিরিয়া এবং মিসরের নগরগুলি এই পুরোহিতরা আমন দেবতার নামে শাসন করতেন। কালক্রমে সমগ্র মিসরের চাষের জমির একটি বিরাট অংশ পুরোহিতদের হাতে আসে। আমনের প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতা ফ্যারাওয়ের ক্ষমতার সমান হয়ে ওঠে। রাজা এবং পুরোহিতদের মধ্যে ক্ষমতায় মধ্যে লড়াই শুরু হয়।

এই ক্ষমতার লড়াইয়ের জন্য মিসরের রাজশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। মিসরের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। খ্রীষ্টপূর্ব এগারশ অব্দে আমন দেবতার এক পুরোহিত রাজ সিংহাসন দখল করে। মিসরে অরাজকতা দেখা দেয়। প্রথমে আসিরিয়া এবং পরে পারসিকরা মিসর অধিকার করে নেয়।

ইরাণ

পারস্যের অভ্যুদয়ঃ ইরাণ পশ্চিম এশিয়ার একটি দেশ। মেসোপটেমিয়ায় যখন জনবসতি গড়ে উঠছিল, ইরাণেও তখন এক জাতের মানুষ বাস করত। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার মত এখানে দ্রুত তালে সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। অত্যন্ত ধীর গতিতে এখানকার লোকেরা মাটির পাত্র গড়বার, তামা গলাবার এবং লিখবার কৌশল আয়ত্ত করে। ইটের ঘর-বাড়ীও তারা তৈরি করতে শেখে।

প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ইরাণে এক নতুন জাতির মানুষ বসতি স্থাপন করে। এদের বলা হয় আর্য। এরা ছিল যাযাবর। এরা প্রথমে ইরাণের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আসে। পরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর্য জাতির এই শাখার মানুষদের নাম ছিল পারসিক। পারসিকরাই ঐ দেশের নাম দেয় ইরাণ অর্থাৎ আর্যদের দেশ।

পারস্য সাম্রাজ্যঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইরাণে পারসিকরা একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এই সাম্রাজ্যটি দুইশ বছরের বেশী টিঁকে থাকে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম কাইরাস। কাইরাস ব্যাবিলন, আসিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর জয় করেন। পরবর্তী সম্রাট প্রথম দারায়ূসের সময় পারস্য সাম্রাজ্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সমগ্র ইরাণ, মেসোপটোমিয়া, সিরিয়া, মিসর, এশিয়া মাইনর এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ

নিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। দারায়ুস পার্সিপলিসে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় মুদ্রার প্রচলন হয়।

প্রাচীন পারস্যের শিল্পকলা এই সময় বিকশিত হয়ে ওঠে। গোটা সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্তাকে বলা হত ক্ষত্রপ।

দারায়ুস এবং তাঁর পরবর্তী পারস্য সম্রাটরা ইউরোপ মহাদেশের গ্রীকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রীকদের কাছে পারসিকদের পরাজয় ঘটে। পারস্য সাম্রাজ্যের ভিত এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পারস্য সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

জরথুষ্ট্র: প্রাচীন ইরাণে নানা রকম ধর্ম বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। কিন্তু জরথুষ্ট্র প্রচারিত ধর্মই ছিল ইরাণের প্রধান ধর্ম। জরথুষ্ট্র তাঁর ধর্মমতে কতকগুলি নতুন নীতির প্রবর্তন করেন। জরথুষ্ট্রের ধর্মের মূল বাণী হল—"ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়"।

পণ্ডিতরা মনে করেন জরথুষ্ট্র খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বাস করতেন। জেন্দাবেস্তা নামক ধর্মগ্রন্থে জরথুষ্ট্রের বাণী লেখা আছে। তাঁর মতে বিশ্বে দুটি শক্তি রয়েছে। একটি ভাল, অপরটি মন্দ। বিশ্বে এবং সকল জীবনে ভাল ও মন্দ, আলো এবং অন্ধকার—দুটি শক্তির মধ্যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব চলছে। সকল শুভ শক্তির দেবতা হলেন আহুর মাজদা এবং



জরথুষ্ট্র

অমঙ্গলের দেবতা আহ্‌রিমা। এই দ্বন্দ্বে একদিন আহুর মাজদাই

জয়ী হবেন। পৃথিবীতে সেদিন ধর্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই দ্বন্দ্বে তবে মানুষের কাজ কি হবে? মানুষ এই দ্বন্দ্বে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকবে না। আহুর মাজদার স্বপক্ষে লড়বার জন্য তাকে কতকগুলি সদ্‌গুণের অনুশীলন করতে হবে।

সূর্য এবং অগ্নিকে আহুর মাজদার প্রতীকরূপে জরথুষ্ট্র পন্থীরা উপাসনা করত। ইহুদীধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম—উভয় ধর্মই জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত ধর্মের কাছে ঋণী। বর্তমানে ভারতের অগ্নি উপাসক পার্শী সম্প্রদায় জরথুষ্ট্রপন্থী।

ইহুদী জাতি

বহুদিন আগে সেমেটিক জাতির একটি শাখার মানুষ ইউফ্রেটিস নদীর মোহানায় বাস করত। তারা ছিল মেষপালক। মেষচারণ ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। মেষের খাদ্য ফুরিয়ে যাওয়ায় তারা ব্যাবিলন রাজার এলাকায় নতুন চরণভূমিতে বসবাস শুরু করে। কিন্তু ব্যাবিলনের সৈন্যরা তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা তখন তাদের এক নেতা—এ্যাব্রাহামের নেতৃত্বে অনেক বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে এক নতুন দেশে বসতি স্থাপন করে। বাইবেলে এই দেশকে বলা হয়েছে কানান বা জুডিয়া। বর্তমানে এই দেশের নাম ইস্রায়েল, ইহুদীজাতির বাসভূমি। আর এই মেষপালক জাতির লোকেদের বলা হয় হিব্রু বা ইহুদী।

জুডিয়ায় এক সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাঁরা বাঁচবার আশায় দল বেঁধে মিসরে উপস্থিত হয়। প্রথমে মিসরে তারা ভাল-ভাবেই বাস করছিল। কিন্তু পরে একজন ফ্যারাও বিদেশীদের ওপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করে। ইহুদীরা মিসরে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। মিসর থেকে তাদের পালাবার সব পথ বন্ধ ছিল।

মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীদের মিসর ত্যাগ: বহুদিন দুঃখ

কষ্ট ভোগ করবার পর মোজেস নামে ইহুদীদের এক নেতা তাদের উদ্ধার করেন। মোজেস বাস করতেন মরুভূমিতে। তিনি এক সহজ সরল জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। বিদেশী সভ্যতার বিলাস ব্যসনের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি নানা ধরনের দেব দেবীর পূজারও বিরোধী ছিলেন। যিহোভা নামে একমাত্র ঈশ্বরকেই তিনি বিশ্বাস করতেন।

মোজেস মিসরীয় সেনাদের ফাঁকি দিয়ে ইহুদীদের পথ দেখিয়ে সিনাই পাহাড়ের নীচে এক সমতলভূমিতে নিয়ে আসেন। ঐ স্থানে মোজেস্ ইহুদীদের একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করতে আহ্বান জানান। তিনি তাঁর অনুগামীদের দশটি নৈতিক উপদেশ বা অনুজ্ঞা দান করেন। মোজেসের উপদেশে ইহুদীরা যিহোভার উপাসনা শুরু করে। তারা দশটি অনুজ্ঞা পালনের শপথ গ্রহণ করে।

দাসত্ব থেকে মুক্তি : বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ইহুদীরা মোজেসের প্রতিশ্রুত দেশ প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হল। কালক্রমে ইহুদীদের রাজা হলেন ডেভিড। তিনি **জেরুজালেম** দুর্গে রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তী রাজা **সলোমন** ইহুদীদের তাঁবুঘেরা উপাসনার স্থানটিতে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সলোমনের পর ইহুদীদের দুর্দশার দিন শুরু হয়। আসিরীয় সৈন্যবাহিনী জেরুজালেম আক্রমণ করে। কিন্তু আসিরীয় সৈন্যদের মধ্যে এক ভীষণ মহামারী দেখা দেয়। সে যাত্রায় ইহুদীরা রক্ষা পায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ব্যাবিলনের রাজা নেবুক্যাডনেজার জেরুজালেম আক্রমণ করে নগরীটি ধ্বংস করেন। তিনি ইহুদীদিগকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে আসেন। বহুদিন ব্যাবিলনের বন্দীশালায় থাকবার পর পারস্য সম্রাট কাইরাস তাদের মুক্ত করেন।

কিন্তু বেশীদিন ইহুদীরা স্বাধীন থাকতে পারে নি। স্বাধীনতা হারাবার পর তারা পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

১। (ক) ব্যাবিলন নামের অর্থ কি? কোথায় এই নগরী অবস্থিত ছিল? ব্যাবিলনের কোন্ রাজা এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন?

(খ) "ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেটি ছিল প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতারই একটি পরিণত রূপ।" উদাহরণ দিয়ে এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ কর।

(গ) নেবুকাড্‌নেজারের সময় ব্যাবিলনের রাজ্য বিস্তার এবং শিল্পকলার সম্বন্ধে লিখ।

(ঘ) ব্যাবিলনে পুরোহিতরা কি কি কাজ করতেন?

(ঙ) ব্যাবিলনের কোন্ রাজার সময় আইন প্রণয়ন হয়? এই আইনের মূল কথা কি ছিল? আইন অনুসারে সমাজে শাস্তির ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

২। (ক) হিক্সস্‌রা কোথা থেকে মিসরে এল? তারা যুদ্ধ বিদ্যায় কি ধরনের অস্ত্র ও যুদ্ধযান ব্যবহার করে? মিসরের সাম্রাজ্য বিস্তারে এই সব বস্তুর কি প্রভাব ছিল।

(খ) মিসরীয় সৈন্যরা কোন্ কোন্ দেশ জয় করে? কোন্ ফ্যারাও মিসরীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন? কোন্ ফ্যারাও হিটাইটদের পরাজিত করেন।

(গ) কিভাবে সাম্রাজ্যের যুগে মিসরে পুরোহিতদের ক্ষমতা বেড়ে যায়? এর পরিণাম কি হয়েছিল?

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর:—

(ক) প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি ব্যাবিলনের —।

(খ) ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা ছিলেন —। আসিরীয় সম্রাট — গ্রন্থাগার ব্যাবিলনের সাহিত্য ভাণ্ডার।

(গ) ব্যাবিলনে — ও — দিয়ে সময় ঠিক করার চল ছিল।

(ঘ) সাম্রাজ্যের যুগে — এবং — নামক স্থানে বিরাট মন্দির ও মূর্তি নির্মিত হয়।

(ঙ) থিব্‌সের প্রধান দেবতা ছিলেন —।

(চ) — কেন্দ্র করে এক রাজবংশ সমগ্র মিসরে এক নতুন রাজ্যের পত্তন করে।

(ছ) — স্থান পুরোহিতদের চেয়ে আরও উঁচুতে ছিল।

৪। (ক) ইরাণ কথাটির অর্থ কি? ইরাণে কোন্ জাতি এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে? এরা কোন্ জাতির শাখা ছিল?

(খ) ইরাণে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? তিনি কোন্ কোন্ দেশ জয় করেন। পরবর্তী সম্রাট কে ছিলেন ? তাঁর সময় কোন্ কোন্ নতুন দেশ পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(গ) ইরাণের প্রধান ধর্মগুরু কে ছিলেন ? তাঁর ধর্মমত আলোচনা কর।

৫। ডান দিক থেকে সঠিক শব্দ বেছে বাঁদিকের শূন্যস্থানে বসাও।

(ক) দারায়ুস —— নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।	আক্কাদে, নিনিভেতে, পার্থিপোলিসে।
(খ) —— নামক ধর্মগ্রন্থে জরথুস্ত্রের বাণী লিখিত আছে।	বাইবেল, বেদ, জেন্দাবেস্তা।
(গ) বর্তমানে ভারতের অগ্নি উপাসক — সম্প্রদায় জরথুস্ত্র-পন্থী।	ইহুদী, শিখ, পার্শী।

৬। (ক) ইহুদীরা কোন্ জাতির শাখা ? তাদের জীবিকা কি ছিল ? কার নেতৃত্বে তারা নতুন দেশে বসতি স্থাপন করে ? বাইবেলে এই দেশের নাম কি ?

(খ) ইহুদীরা দেশ ছেড়ে মিসরে গেল কেন ? সেখানে তাদের অবস্থা কেমন ছিল ? মিসর থেকে তারা কার নেতৃত্বে পালিয়ে এল ?

(গ) মোজেস কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

(ঘ) ইহুদীদের দুইজন রাজা ও তাদের প্রধান কীর্তি আলোচনা কর। ব্যাবিলনের কোন্ রাজা তাদের বন্দী করেন ? কে তাদের মুক্ত করেন।

৭। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) যিহোভা কে ? (খ) ইহুদীদের দশটি অনুজ্ঞা কার এবং কোন্ মহাপুরুষ দান করেন ? (গ) মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীরা কোন্ দেশে বসতি স্থাপন করে ? (ঘ) প্রথমে ইহুদীদের উপাসনার স্থান কেমন ছিল ?

(২) গ্রীস

ইউরোপ মহাদেশের ছোট্ট একটি দেশ গ্রীস। আজকালকার ইতিহাসের পাতায় গ্রীসের স্থান নগণ্য মনে হতে পারে। একদিন

তা ছিল না। দু' হাজার বছর পূর্বের কথা। ইউরোপের তখনও ঘুম ভাঙেনি। ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে গ্রীসে ধীরে ধীরে জ্ঞান সূর্যের উদয় হয়। সেই কিরণ স্পর্শে ইউরোপের ঘুম ভাঙে। আজ ইউরোপের যে বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার জননী হল গ্রীক সভ্যতা।

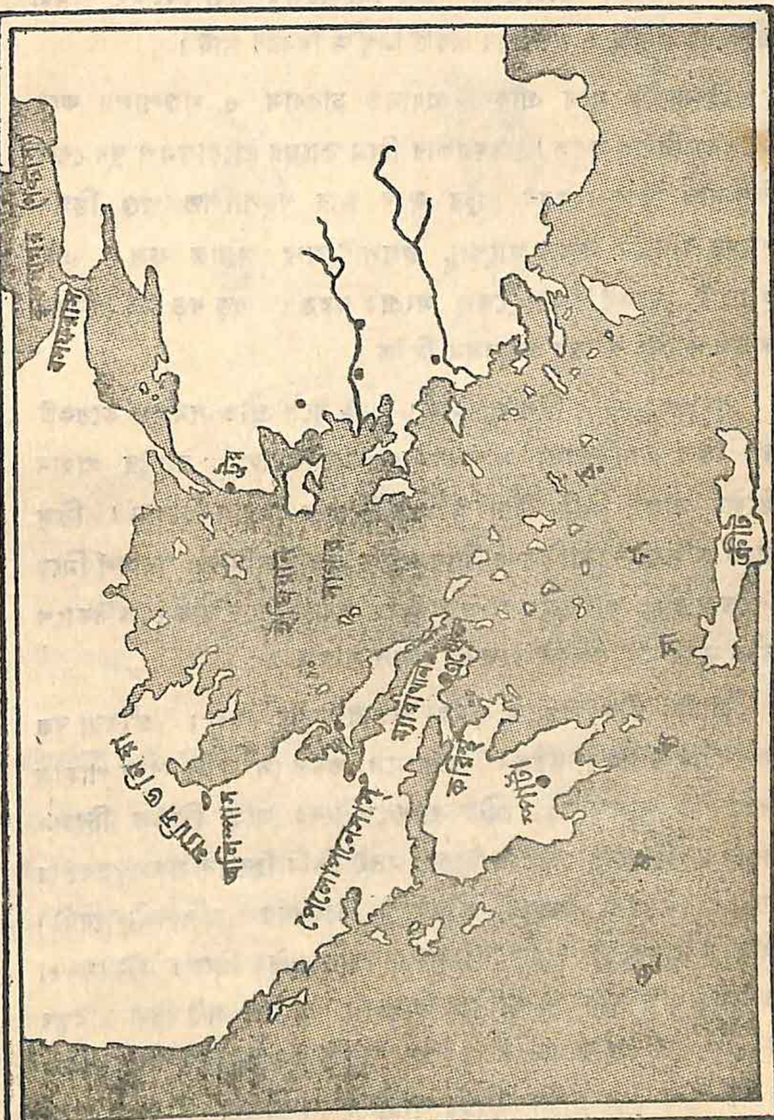
ক্রীট সভ্যতার প্রভাব: গ্রীকরা ছিল লৌহযুগের মানুষ। পারসিকদের মত তারা ছিল আর্য জাতির একটি শাখা। তাদের গ্রীসে আসার আগে ইজিয়ান সাগরের প্রান্তে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপে এক সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এ সভ্যতা মিসরীয়, সুমেরীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার প্রায় সমকালীন। ক্রীটের সভ্যতা ছিল ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা।

ক্রীটবাসীরা বিভিন্ন ধাতু মিশ্রণের প্রক্রিয়া ও ব্যবহার জানত। তারা সুন্দর সুন্দর নগর গড়েছিল। নগরগুলিতে জল সরবরাহ এবং জল নিকাশের চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। তারা মাটির পাত্র তৈরি করে তার ওপর সুন্দর সুন্দর নক্সা আঁকত। পাথরের ওপরের খোদাই করা, ছবি আঁকা, গয়নাগাটি তৈরি করা, পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করা প্রভৃতি নানা কাজে ক্রীটবাসীরা দক্ষ ছিল। তারা এক ধরনের হরফে লিখতে পারত। প্রাচীন ক্রীটবাসীরা ছিল নৌবিদ্যায় নিপুণ। মিসর এবং আশপাশের দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ক্রীট অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নসাস্ নগরী ছিল তাদের রাজধানী। ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক কারণে এই নগরী ধ্বংস হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে গ্রীসের দক্ষিণ অংশে মাইকেনিতে গ্রীকদের একটি শাখা বসতি স্থাপন করে। এরা ক্রীট সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রহণ করে। কালক্রমে এই গ্রীকরাই ক্রীটের সমৃদ্ধ নগর সভ্যতার বিলোপ ঘটায়। পরবর্তীকালে গ্রীসের শিল্পকলা, খেলাধুলা, শরীর চর্চা প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই ক্রীট সভ্যতার প্রভাব দেখা যায়।

হোমারীয় গ্রীস :—গ্রীকদের মধ্যে একদল লোক ছিলেন কবি

ও চারণ। এই চারণদের মাধ্যমেই এক যুগের সাথে আর এক যুগের যোগাযোগ রক্ষা হত। দুইটি মহাকাব্য ইলিয়ড ও ওডিসী প্রাচীন



গ্রীক সাহিত্যের বিশিষ্ট গ্রন্থ। এই মহাকাব্য দুইটির রচয়িতা ছিলেন হোমার নামে এক অন্ধ গ্রীক চারণ কবি।

গ্রীকরা ফ্রিজিয়ান নামে এক জাতির ট্রয় নামে একটি সুন্দর ও শক্তিশালী নগরী আক্রমণ করে। এই ট্রয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই ঐ দুটি মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। এই মহাকাব্যের মধ্য থেকেই আমরা গ্রীকদের সমাজ ও সভ্যতার একটি নিখুঁত বিবরণ পাই।

হোমারীয় যুগে গ্রীকরা প্রধানত চাষবাস ও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। তখনকার দিনে তাদের প্রয়োজনও খুব বেশী ছিল না। প্রত্যেকেরই প্রচুর জমি আর গৃহপালিত পশু ছিল। তাদের বাগানে ফলত আপেল, জলপাই আর অন্যান্য ফল। এই জলপাই থেকেই তারা তেল সংগ্রহ করত। বড় বড় যব ক্ষেতের ফসলে তাদের খাদ্যের প্রয়োজন মিটত।

সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। এই যুগে গ্রীক সমাজে কয়েকটি স্তর ছিল—অভিজাত, সাধারণ এবং ক্রীতদাস। রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন রাজা, তিনি বিচারক ও ধর্ম-কর্মের প্রধান ছিলেন। কিন্তু তাঁকে অভিজাত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সমিতির পরামর্শ নিয়ে চলতে হত। কালক্রমে অভিজাতদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। অধিকাংশ গ্রীক নগর-রাষ্ট্র থেকেই রাজতন্ত্র লোপ পায়।

প্রাচীন গ্রীক সমাজে ধর্মের প্রভাব গভীর ছিল। গ্রীকরা বহু দেবদেবীর উপাসনা করত। তার মনে করত যে অলিম্পাস পাহাড় দেবদেবীর বাসস্থান। গ্রীক দেব-দেবীদের মধ্যে জিউস ছিলেন প্রধান। হিন্দুদের দেবরাজ ইন্দ্রের মতই তিনি ছিলেন সকল দেবতার রাজা। এথেনা ছিলেন গ্রীকরাষ্ট্রে এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ডেলফি নামক স্থানে এ্যাপোলো দেবতার মন্দির ছিল। এই দেবতা জিউসের বাণী গ্রীকদের জানিয়ে দিতেন। এইসব বাণী ছিল ভবিষ্যৎ বাণী। তাই গ্রীকদের মধ্যে এ্যাপোলো দেবতার বিশেষ প্রভাব ছিল। এই এ্যাপোলো মন্দিরে প্রাচীনকালে বিভিন্ন গ্রীকরাষ্ট্র থেকে দলে দলে প্রতিনিধিরা আসতেন। সেখানে ধর্মসংক্রান্ত সকল বিষয়ের আলোচনা হত।

নগর রাষ্ট্র :—প্রথম থেকেই গ্রীসদেশ নানাভাগে বিভক্ত ছিল। গ্রীসের পাহাড়-পর্বত সারা দেশকে নানাভাগে ভাগ করে রেখেছিল।



দেবতা জিউস

এর ফলে এক একটি নগরী এক একটি আলাদা নগর রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠেছিল। এদের শাসন-ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। এইসব নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ, মেগারা প্রভৃতি।

একতার বন্ধন :—প্রকৃতির ভাগাভাগি কিন্তু গ্রীকদের মনের একতাকে নষ্ট করতে পারেনি। গ্রীকদের ঐক্যের প্রধান সূত্র ছিল রক্তের সম্বন্ধ। গ্রীকরা প্রত্যেকেই মনে করত তারা একই পূর্বপুরুষদের সন্তান। নানা জাতীয় ক্রীড়ার মধ্য দিয়েও গ্রীক জাতির ঐক্যবোধ প্রকাশ পেত। এইসব ক্রীড়ার মধ্যে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এই প্রতিযোগিতা সর্বপ্রথম শুরু হয় খ্রীষ্টপূর্ব

সাত শত ছিয়াত্তর সালে। এই প্রতিযোগিতায় যে জয়ী হত তার পুরস্কার ছিল একটি অলিভ পাতার মালা। কোনও গ্রীক এর চেয়ে বড় সম্মান কল্পনা করতে পারত না। সারা গ্রীস দেশের নানা অঞ্চল থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগীরা চার বছর অন্তর এই প্রতিযোগিতায় মিলিত হত। আজও সারা বিশ্বের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অলিম্পিক প্রতিযোগিতা নামে পরিচিত।

একই ভাষা, সাহিত্য, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম প্রভৃতি সকল গ্রীকদের মনে বহু অনৈক্যের মধ্যেও একটি মহান ঐক্যের ভাব বজায় রেখেছিল।

উপনিবেশ স্থাপন :— গ্রীস গিরি-উপত্যকার দেশ। সমতলভূমি বা নদ-নদী এখানে বেশী ছিল না। ইজিয়ান সাগরে ছিল অসংখ্য দ্বীপ। এই সাগরই এশিয়া ও গ্রীসকে যুক্ত করেছে। এই অগণিত দ্বীপকে আশ্রয় করে জলপথে চলাচল সহজ ছিল। মিসরের মত গ্রীস শস্য-শ্যামলা ছিল না। লোক বসতি বেড়ে যাওয়াতে গ্রীকদের খাদ্যের অভাব দেখা দিল। সাগর পারের শস্য-শ্যামলা দেশের প্রতি গ্রীকগণ আকৃষ্ট হল। জলপথে গড়ে উঠল বিপুল বাণিজ্য। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই গ্রীক উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

প্রথমে উপনিবেশের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলিতে জনসংখ্যার চাপ বেড়ে যাওয়ায় উপনিবেশের সংখ্যাও বেড়ে যায়। শীঘ্রই এশিয়া মাইনর, স্পেন, দক্ষিণ ইতালি, দক্ষিণ এবং পূর্ব সিসিলিতে বহু গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এইসব উপনিবেশগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পূর্ব দিকে বসপোরাস প্রণালীর পাশে বাইজানটিয়াম নামে একটি গ্রীক উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

এথেন্স ও স্পার্টা

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন :—এথেন্স এবং স্পার্টা ছিল গ্রীসের দুটি প্রধান নগর-রাষ্ট্র। এই দুই নগরীর লোকেরা একই ভাষায়

কথা বলত। অন্যান্য সব বিষয়ই কিন্তু তারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এথেন্স নগরী সমতলভূমি থেকে ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছিল। সমুদ্রের মুক্ত বায়ু সব সময়ই এখানে বয়ে চলত। ঐ মুক্ত হাওয়া এথেন্সবাসীর মনকে সব সময়ই মুক্ত আর উদার করে রাখত। অপর দিকে স্পার্টানগরীর সৃষ্টি এক গভীর উপত্যকায়। চারপাশের খাড়া দেয়ালগুলি স্পার্টাবাসীর মনকে বদ্ধ করে রেখেছিল। বাইরের কোন চিন্তা ভাবনা সেখানে ঢুকতে পারত না। সমুদ্রপথে এথেন্সের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে যায়। আর স্পার্টা এক সামরিক শিবিরে পরিণত হয়। সৈনিকের জীবনই স্পার্টাবাসীর চরম লক্ষ্য হয়।

এথেনীয়রা সূর্যের আলোয় খোলা জায়গায় বাস করতে এবং কাব্য আলোচনা করতে ভালবাসত। তারা ছিল শিল্পী। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তারা পাত্রের গায়ে বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলত। অপরদিকে স্পার্টার মানুষ কাব্য বা কোনও সার্থক সাহিত্য রচনা করতে পারেনি। তারা শিখেছিল যুদ্ধ করতে, আর যুদ্ধ করতেই তারা ভালবাসত। মনুষ্য জীবনের যা কিছু সুন্দর আর কোমল সব-কিছুই তারা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে উৎসর্গ করত।


নক্সা আঁকা গ্রীসীয় পাত্র

স্পার্টা ও এথেন্সের জীবন-ধারায় এই পার্থক্য তাদের রাজনৈতিক ও সমাজজীবনেও ফুটে উঠেছিল। স্পার্টার সমাজে প্রধানত দুইটি শ্রেণী ছিল—অভিজাত ও দাস। দাসদের সংখ্যাও ছিল বেশী। চাষ-বাস এবং অন্যান্য কাজ তারাই করত। অভিজাত শ্রেণীর সকল পুরুষের পক্ষে সেই জন্য সৈনিক হওয়া সম্ভব ছিল। স্পার্টায় ছিল

রাজতন্ত্র। স্পার্টার রাজাদের প্রধান কাজ ছিল সামরিক। দেশের শাসন কাজে তাঁদের সাহায্য করত অভিজাত শ্রেণীর একটি সভা ও পরিষদ।

এথেন্সে প্রথম অবস্থায় রাজতন্ত্র ছিল। কিন্তু পরে সেখানে অভিজাতদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে অভিজাত এবং দাস ছাড়াও ছিল এক শ্রেণীর স্বাধীন নাগরিক। এদের মধ্যে ছিল কৃষক, শ্রমিক, কারিগর এবং ব্যবসায়ী। তারা অভিজাতদের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ফলে এক নতুন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। একে বলে গণতন্ত্র। এথেন্সের শাসন কাজে প্রায় সকল সাবালক নাগরিকই অংশ গ্রহণ করত।

এথেন্স বনাম স্পার্টা—গ্রীসের এই দুটি প্রধান নগরী কিন্তু বেশী দিন নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে পারে নি। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পারসিকদের সাথে যুদ্ধে এথেন্স এবং স্পার্টা উভয় দেশই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। পারসিকদের পরাজয়ে কিন্তু এথেন্সের প্রভাবই বেড়ে যায়। যুদ্ধের পর এথেন্স এক বিরাট নৌ-সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। দুটি ছোট ছোট গ্রীক নগরীর বিবাদকে কেন্দ্র করে স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ পেলোপনেসীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। পরিণামে এথেন্স পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এথেন্সের উঁচু প্রাচীরগুলি ধূলিসাৎ করা হয়। স্পার্টাবাসীরা এথেন্সের নৌবহর অধিকার করে। এথেন্সের বিশাল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

এথেন্সের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ—এথেন্সে সাংস্কৃতিক জীবনের চরম উন্নতি ঘটেছিল। গ্রীসের সভ্যতার সুন্দরতম রূপ ফুটে

উঠেছিল এথেন্সে। সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রীসের গর্ব। আর এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রধানত এথেন্স নগরীর দান।

এথেন্সের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের মূলে ছিল এক মহান এথেন্সবাসীর অবদান। তাঁর নাম পেরিক্লিস। তাঁর প্রতিভায় ক্ষুদ্র এথেন্স নগরীকে ভিত্তি করে একটি সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। তাঁর প্রচেষ্টায় এথেন্স নগরী সুরক্ষিত হয়। এই নগরীকে সুন্দরভাবে শিল্পকার্য ও ভাস্কর্যে অপরূপ করে তোলার কাজে তিনি ব্রতী হলেন।



পেরিক্লিস

এথেন্সের সুরক্ষিত অংশে তিনি অনেকগুলি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করালেন। মিসর বা ব্যাবিলনের মত এই মন্দিরগুলি বিশাল ছিল না। কিন্তু এগুলির সৌন্দর্য ছিল তুলনাহীন। সবচেয়ে সুন্দর ছিল এথেনা দেবীর মন্দির পার্থেনন। এই মন্দিরটি ছিল আগাগোড়া শ্বেতপাথরে তৈরী। এই মন্দিরের স্তম্ভ এবং ভাস্কর্যের কাজ ছিল অপূর্ব। এথেনা দেবীর মূর্তিটিও ছিল চমৎকার। ফিডিয়াস নামে এক বিখ্যাত ভাস্কর এই মূর্তিটি নির্মাণ করেন। পার্থেননের পাশে ছিল সমুদ্রের দেবতা পসিডনের মন্দির।

এথেন্সে গীতিকাব্য এবং নাট্য সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। স্যাফো ছিলেন একজন বিখ্যাত মহিলা কবি। পিণ্ডার নামে এক কবি বিজয়ী ক্রীড়া-প্রতিযোগীদের নিয়ে অপূর্ব গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন। পেরিক্লিসের সময় নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের বিশেষ উন্নতি হয়। তিনি ডায়োনিসাসের নাট্যশালাটি নতুন করে নির্মাণ করেন। পাহাড়ের পাশে এই নাট্যশালায় অর্ধচন্দ্রাকারে সারি সারি

দর্শকদের আসন ছিল। মুখোস পরে অভিনেতারা নাট্য মঞ্চে অভিনয় করতেন। পেরিক্লিসের যুগে নাটক রচনার দিক দিয়েও এথেন্স সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মিলনাত্মক, বিয়োগান্তক এবং ব্যাঙ্গাত্মক প্রভৃতি নানা ধরনের নাটক রচিত হয়েছিল। সফোক্লিস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিয়োগান্তক নাট্যকার। তাঁর লেখা ঈদিপাস রেক্স, এ্যান্টিগোনে প্রভৃতি নাটকগুলি আজও সারা পৃথিবীতে সমাদর পেয়ে আসছে।

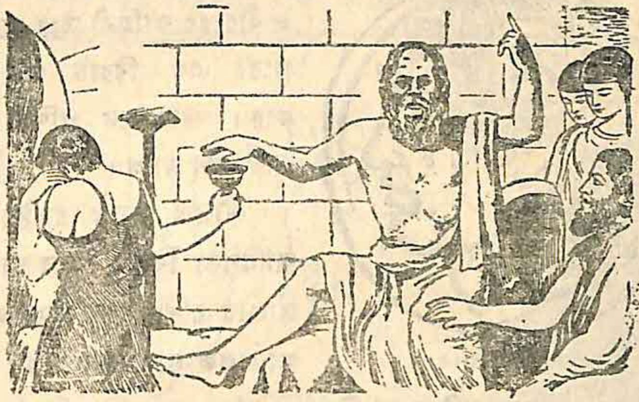


হেরোডোটাস

ভাস্কর এবং নাট্যকার ছাড়াও এথেন্স নগরীকে সমৃদ্ধ করেছিলেন ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস। তাঁর জন্মস্থান ছিল এশিয়া মাইনরে। তিনি মিসর, পারস্য ও প্যালেস্টাইন পর্যটন করে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি পারস্য ও গ্রীসের যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেন। এই ইতিহাসটির নয়টি খণ্ড এবং প্রত্যেক খণ্ড এক একটি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিসও ছিলেন এথেন্সের নাগরিক। সক্রেটিস অকাট্য যুক্তি ও জ্ঞানের প্রয়োগে এথেন্সবাসীর মনকে সংস্কারমুক্ত করতে চেষ্টা করেন। এথেন্সবাসীরা কিন্তু সেই স্বাধীন চিন্তানায়ককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সক্রেটিস বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে

আত্মপক্ষের সমর্থনে যে কথাগুলি বলেন, আজও তা সারা বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে আছে। অন্যান্য অনেক কথার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন—



বিষ পানের পূর্বে সক্রেটিস

"পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে আমাকে ভুল পথে চলতে বাধ্য করবে। আদর্শের পথ থেকে সরে আসবার পরিবর্তে আমি এই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত আছি।" বাক্যের, চিন্তার আর আদর্শের স্বাধীনতার জন্য এই মহাপুরুষ নিজের হাতে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেন।

ম্যাসিডন

পেলোপনেসীয় যুদ্ধের ফলে গ্রীসের প্রধান দুটি রাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে ধীরে ধীরে অপর একটি রাজ্যের শক্তি বেড়ে ওঠে। এই রাজ্যটির নাম ম্যাসিডন। ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন ফিলিপ। তিনি ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে একত্র করে তাদের একচ্ছত্র রাজা হলেন। তিনি এক সুদৃঢ় সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন এবং ইরাণ বিজয়ের আয়োজন করলেন। কিন্তু অভিযান আরম্ভ করার আগেই তিনি এক অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে প্রাণ হারান।

আলেকজাণ্ডার ও তাঁর ভারত অভিযান—ফিলিপের পর তাঁর

পুত্র আলেকজাণ্ডার মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ম্যাসিডনের রাজা হন। হোমারের মহাকাব্যে যুদ্ধের বর্ণনা ও বীরত্বের কাহিনী তাঁর মনে যুদ্ধ জয়ের এক বিরাট স্বপ্ন রচনা করে। তাঁর মনে পৃথিবী জয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগে।

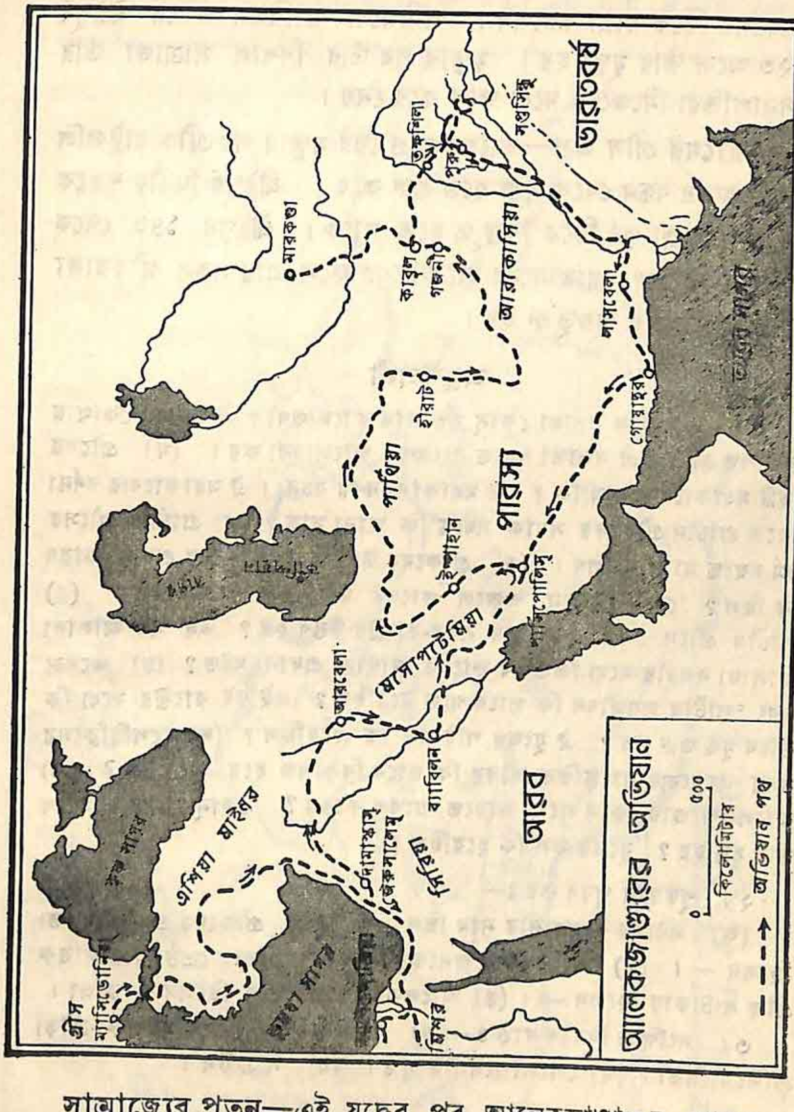

আলেকজাণ্ডার

গ্রীসের সমস্ত রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আলেকজাণ্ডার এশিয়া জয়ে যাত্রা করেন। আলেকজাণ্ডার জলপথে সাগর পার হয়ে এশিয়ার মাটিতে পা দিলেন। তাঁর সাথে ছিল ত্রিশ হাজার পদাতিক ও সাড়ে চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। পারস্য সাম্রাজ্য তখন ছিল বিশাল। বিরাট তার সৈন্যবাহিনী এবং ঐশ্বর্যও ছিল অফুরন্ত। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের রণকৌশলের নিকট পারস্যের শক্তি চুরমার হয়ে গেল।

পারস্য জয়ের পর আলেকজাণ্ডার আফগানিস্তান এবং তারপর হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করেন। এই সময় ঐ অঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। তাদের মধ্যে কোন একতা ছিল না। আলেকজাণ্ডার এই সুযোগে কতকগুলি রাজ্য জয় করলেন। আবার তক্ষশীলার মত কয়েকটি রাজ্য বিনাযুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল।

তক্ষশীলা জয়ের পর আলেকজাণ্ডার পুরুর রাজ্য আক্রমণ করেন। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মাঝামাঝি ছিল পুরুর রাজ্য। পুরুর সৈন্য সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু তাঁর সাথে অনেকগুলি হাতী থাকায় গ্রীকদের ঘোড়াগুলি প্রথমে খুব ভয় পেল। আলেকজাণ্ডার গোপনে এক অন্ধকার রাত্রে কিছুটা দূরে নদী পার হবার ব্যবস্থা করলেন। পুরুরাজ দেরীতে এই কৌশল বুঝতে পারলেন। তারপর শুরু হল যুদ্ধ। পুরু প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত আহত ও পরাজিত হলেন।

তাঁকে বন্দী অবস্থায় আলেকজাণ্ডারের সামনে আনা হল। গ্রীক সম্রাট তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।



সাম্রাজ্যের পতন—এই যুদ্ধের পর আলেকজাণ্ডারের রণক্লান্ত সৈন্যবাহিনী আর ভারতের মাটিতে এগুতে চাইল না। নিজেদের চোখে পুরুরাজের বীরত্ব দেখে এবং মগধের শক্তি ও সৈন্যদলের কথা শুনে তারা ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই বাধ্য হয়েই আলেকজাণ্ডারকে

ফিরতে হল। তাঁর একদল সৈন্যকে তিনি জলপথে পারস্যের দিকে পাঠালেন। অপর একদল সৈন্য নিয়ে তিনি বেলুচিস্তানের পথে স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে ব্যাবিলন নগরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

রোমের গ্রীস জয়—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক রাষ্ট্রগুলি ম্যাসিডনের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে শুরু করে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রোম সাম্রাজ্য পূর্ব দিকে বিস্তৃত হতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৬ থেকে ৩০ সালের মধ্যে রোমানদের আক্রমণের ফলে প্রায় সকল গ্রীকরাজ্য রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অনুশীলনী

১। (ক) গ্রীক সভ্যতা কোন্ সভ্যতার কাছে ঋণী? ঐ সভ্যতা কোথায় বিকশিত হয়? ঐ সভ্যতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (খ) গ্রীসের দুইটি মহাকাব্যের নাম কি? ঐ মহাকাব্য কার রচনা। ঐ মহাকাব্যের বর্ণনা থেকে প্রাচীন গ্রীকদের সমাজ সম্বন্ধে কি জানা যায়? (গ) প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লিখ। (ঘ) গ্রীকদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান কারণ কি ছিল? কোন্ কোন্ অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে? (ঙ) প্রাচীন গ্রীসে কেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়? এই সব আলাদা আলাদা নগরীর মধ্যে কিভাবে ভাবের আদান প্রদান ঘটত? (চ) এথেন্স এবং স্পার্টার জনজীবন কি ভাবে গড়ে উঠেছিল? এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কি ভাবে যুদ্ধ শুরু হল? ঐ যুদ্ধের পরিণাম কি হয়েছিল? (ছ) পেরিক্লিসের সময় এথেন্সের সাংস্কৃতিক জীবন কি ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল? (জ) আলেকজাণ্ডার কোন পথে ভারতে প্রবেশ করেন? কোন্ রাজার সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়? যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:—

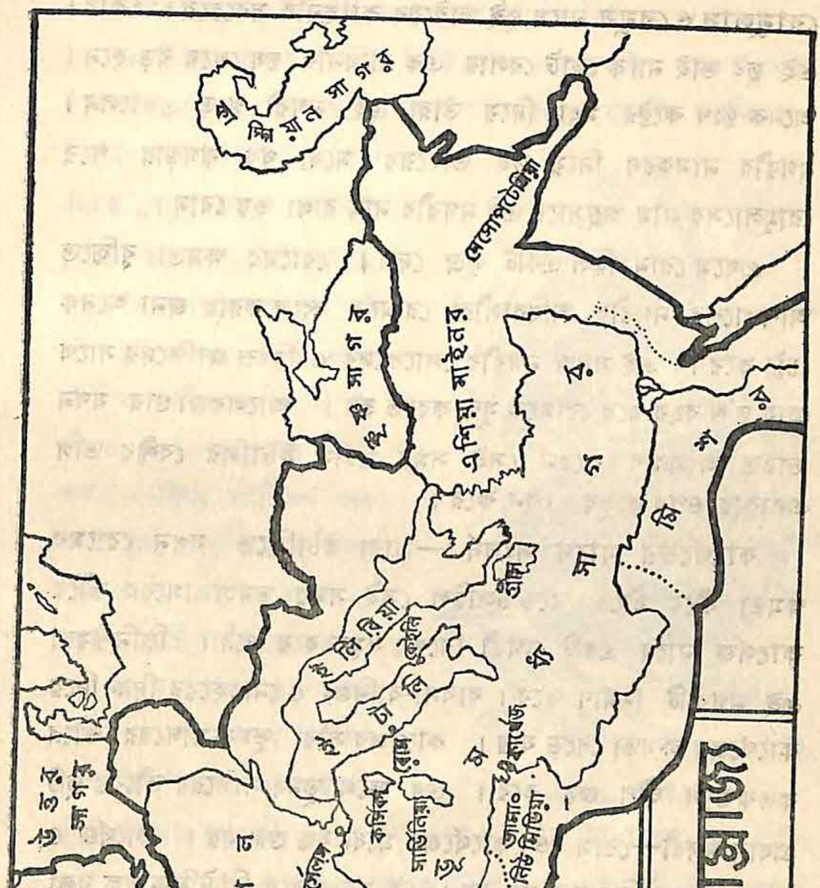
(ক) ক্রীটের রাজধানীর নাম ছিল —। (খ) গ্রীকদের প্রধান দেবতা ছিলেন —। (গ) ইতিহাসের জনকের নাম —। (ঘ) শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্তক গ্রীক নাট্যকার ছিলেন —। (ঙ) আলেকজাণ্ডার প্রথমে ছিলেন — রাজা।

৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:—(ক) হোমার। (খ) অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। (গ) পেলোপনেসীয় যুদ্ধ। (ঘ) সক্রেটিস।

(৩) রোম

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইউরোপ মহাদেশের ইটালিতে একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্য নগরী গড়ে ওঠে। এই নগরীর নাম রোম।

টাইবার নদীর ধারে একটি উঁচু পাহাড়ের ওপর এই নগরীটি অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা লাতিন নামে এক আর্য ভাষায় কথা



বলত। গ্রীক সভ্যতার পর রোম নগরীকে ভিত্তি করে ইউরোপে আর একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই সভ্যতার নাম রোম সভ্যতা।

রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা :—রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক মত প্রচলিত। এসব অধিকাংশই উপকথার কাহিনী। এদের মধ্যে রোমুলাস ও রেমুস নামে দুই ভাইয়ের কাহিনীই সবচেয়ে চমৎকার। এই দুই ভাই নাকি ছোট বেলায় এক বাঘিনীর দুধ খেয়ে বড় হনে। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁরা এই নগরী গড়ে তোলেন। নগরীর নামকরণ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে খুব ঝগড়ার পরে রোমুলাসের নাম অনুসারে এই নগরীর নাম রাখা হয় রোম।

প্রথমে রোম ছিল একটি ক্ষুদ্র দেশ। রোমের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আশপাশের নগরীর অধিবাসীরা রোমকে ধ্বংস করার জন্য অনেক চেষ্টা করে। এই সমস্ত নগরীর লোকেদের ও হিংস্র জাতিদের সাথে প্রায় দু'শ বছর ধরে রোমকে যুদ্ধ করতে হয়। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন সেই সময় রোম ইটালির বেশীর ভাগ এলাকার ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে।

কার্থেজের সাথে সংঘর্ষ :—সারা ইটালিতে যখন রোমের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বেড়ে চলছিল সেই সময় ভূমধ্যসাগরের তীরে কার্থেজ নামে একটি নগরী বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ফিনিশীয়রা এই নগরীটি নির্মাণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌবহরের দিক দিয়ে কার্থেজের ক্ষমতা বেড়ে যায়। কার্থেজবাসীরা ভূমধ্যসাগরের তীরে কতকগুলি দ্বীপ জয় করে। এর ফলে ভূমধ্যসাগরের তীরের দুটি প্রধান নগরী—রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। কার্থেজ ও রোমের মধ্যে তিন বার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধগুলিকে পিউনিক যুদ্ধ বলা হয়। লাতিন ভাষায় কার্থেজের নাম পিউনিক।

ইটালির ঠিক দক্ষিণে সিসিলি নামে একটি বড় দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের অধিকার নিয়ে প্রথম পিউনিক যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথমে নৌযুদ্ধে রোম কার্থেজের মত শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই রোমানরা একশটি নতুন ধরনের জাহাজ তৈরি করল। রোমের এইসব নতুন জাহাজের সামনে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে কার্থেজ সিসিলি দ্বীপের ওপর রোমের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিল।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধের কুড়ি বছরের মধ্যে রোমের সঙ্গে কার্থেজের কোন সংঘর্ষ ঘটেনি। এই সময়ের মধ্যে কার্থেজ স্পেন জয় করে। স্পেনের খনি থেকে কার্থেজ প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়। রোমের কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য কার্থেজ তৈরি হতে থাকে।

একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আক্রমণ নিয়ে রোম ও কার্থেজের মধ্যে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ শুরু হয়। কার্থেজের সেনাপতি ছিলেন মহাবীর হ্যানিবল। তিনি এক বিরাট বাহিনী নিয়ে স্পেন থেকে ইটালি যাত্রা করেন। এই পথের দূরত্ব ছিল পঁচাশ মাইল। এই দীর্ঘ এবং বিপদ সঙ্কুল পথে তাঁর বাহিনীর প্রায় অর্ধেক শীতে এবং অনাহারে বিনষ্ট হয়। কিন্তু হ্যানিবল সব বাধা তুচ্ছ করে আল্‌স্‌ পর্বত পার হলেন। রোমানরা হ্যানিবলের কাছে পরাজিত হয়।



মহাবীর হ্যানিবল

প্রথম পরাজয়ে কিন্তু রোমানরা মনোবল হারায়নি। তারা ইটালির বাইরে কয়েকটি যুদ্ধে কার্থেজ বাহিনীকে পরাজিত করে। পরে তারা কার্থেজ নগরী আক্রমণ করে। বাধ্য হয়েই হ্যানিবলকে দেশে ফিরতে হল। জামার যুদ্ধে হ্যানিবল পরাজিত হলেন। পরাজয় এবং অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করলেন।

বিজয়ী রোমানরা কার্থেজের ধনরত্ন লুঠ করে নিল। কার্থেজের নৌবহর দুর্বল করা হল। কিন্তু কার্থেজ ধ্বংস হল না। ধীরে ধীরে কার্থেজবাসীরা আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। তাদের এই সমৃদ্ধি রোম সহ্য করতে পারল না। রোম কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করল। তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজবাসীরা প্রাণপণে রোমানদের বাধা দিতে লাগল। রোমানরা কার্থেজ অবরোধ করে রাখল। দীর্ঘদিন অবরোধের পর রোমানরা কার্থেজ নগরীতে প্রবেশ করল। তারা কার্থেজের সুন্দর সুন্দর মন্দির, প্রাসাদ সমস্ত পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। অল্প সংখ্যক কার্থেজবাসী যারা বেঁচে ছিল তাদের বন্দী করে রোমে চালান দেওয়া হল। এইভাবে প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরী কার্থেজ চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।

আদিযুগে রোমের সমাজ :—প্রথম দিকে রোমের সমাজে দুটি ভাগ ছিল—একটিকে বলা হত **পেট্রিসিয়ান**, অপরটির নাম ছিল **প্লিবিয়ান**। পেট্রিসিয়ানরা ছিল সমাজের ওপরতলার লোক। অভিজাত এবং বড় বড় জমিদার ছিল এই শ্রেণীতে। এরাই ছিল সেনেটের সদস্য, রোমানদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এদিকে শ্রমিক, ছোট চাষী, কারিগর, ছোট ব্যবসায়ী আর সৈনিকদের বলা হত প্লিবিয়ান। দেশের শাসন-ব্যবস্থায় তাদের কোন হাত ছিল না। তাদের ওপর করের বোঝা চাপানো হত এবং প্রায়ই তাদের শাস্তি পেতে হত। এ অবস্থা অসহনীয় হলে তারা বিদ্রোহী হল।

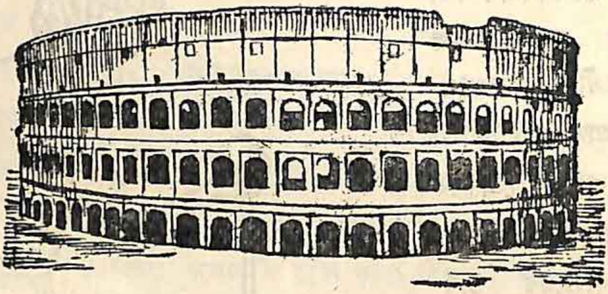
খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে রোমে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। **কন্সাল** নামে দুইজন রাজকর্মচারী, সেনেট এবং পরিষদ নিয়ে রোমের শাসনকাজ চলত। এই কন্সালদের দু'বছরের জন্য নির্বাচিত করত পরিষদ। কিন্তু সেনেটের হাতেই বেশী ক্ষমতা ছিল। সেনেট পরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারত। দেশের আয়-ব্যয়ের ভারও ছিল সেনেটের হাতে। কন্সালরা যুদ্ধ পরিচালনা করত, দেশের আইন ঠিকমত চালু করত ও বিচার করত। পেট্রিসিয়ানরা বিদ্রোহ করে কয়েকটি অধিকার লাভ করল। তারা ট্রিবিউনদের নির্বাচন করতে পারত। ট্রিবিউনরা সেনেট ও কন্সালদের আইন কানুন বাতিল করতে পারত। এছাড়া দেশের আইনগুলিও লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে জনসাধারণ তাদের আইনগত অধিকারগুলি জানতে পারল। পরে প্লিবিয়ানরাও কন্সাল হবার অধিকার পেল।

রোমের নাগরিক ঃ—প্রথম দিকে রোম ইটালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরী জয় করে। এইসব নগরীর লোকেরা আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ভাষার দিক দিয়ে প্রায় রোমানদের মতই ছিল। এইসব নগরগুলি জয়ের পর রোমানরা তাদের প্রতি খুব উদার ব্যবহার করত। কতকগুলি নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীরা রোমান নাগরিকের অধিকার পেল। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে তাদের অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হল।

রোমের ক্রীতদাস ঃ—ইটালির বাইরে যখন রোমের প্রভুত্ব বিস্তৃত হতে লাগল, তখন লক্ষ লক্ষ পরাজিত বন্দীকে রোমে আনা হল। তাদের ক্রীতদাস রূপে বিক্রী করা হল। রোম সমাজ ধীরে ধীরে ক্রীতদাসদের প্রভু এবং ক্রীতদাস এই দু' শ্রেণীতে পরিণত হল। এইসব ক্রীতদাসদের চাষ-আবাদের, খনির, রাস্তাঘাট তৈরীর, কারখানার এবং জাহাজের কাজে লাগানো হত। তাদের ওপর দারুণ অত্যাচার করা হত। ঘর গৃহস্থালীর কাজ যারা করত তাদের অবস্থা কিছু ভাল ছিল। অন্যান্য ক্রীতদাসদের পায়ে শিকল বেঁধে রাখা হত। তাদের কোমরে বাঁধা থাকত একটা তকমা। তাতে লেখা থাকত —আমাকে ধরে রাখ, যেন আমি পালাতে না পারি।


রোমের ক্রীতদাস

রোমের অধিবাসীরা নানা ধরনের আমোদ প্রমোদ উপভোগ করত। রোমের সার্কাসে মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তী, দৌড় এবং রথ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। রোমের এম্পিথিয়েটারে যোদ্ধাদের খেলা দেখানো হত। এইসব যোদ্ধাদের বলা হত **গ্ল্যাডিয়েটার**। এইসব যোদ্ধাদের বেশীর ভাগই ছিল ক্রীতদাস। ধনীরা ক্রীতদাসদের যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করত। এইসব যোদ্ধা-ক্রীতদাসদের এম্পিথিয়েটারের মধ্যে যুদ্ধ করতে হত—কখনও অপর যোদ্ধার সাথে আবার কখনও হিংস্র জন্তুর সাথে। এই নিষ্ঠুর খেলা দেখবার জন্য হাজার হাজার মানুষের বসবার ব্যবস্থা ছিল। রোমের বিরাট এম্পিথিয়েটারটি



কলোসিয়াম

কলোসিয়াম নামে পরিচিত। এখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার দর্শকের বসবার স্থান ছিল।

ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ: ক্রীতদাসদের ওপর ধনীদের অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমে ক্রীতদাসরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন **স্পার্টাকাস** নামে একজন গ্ল্যাডিয়েটার। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে সাধারণ ক্রীতদাস ও গ্ল্যাডিয়েটারদের এক বিরাট সংগঠন গড়ে ওঠে। দু'বছর ধরে রোমের সুশিক্ষিত সেনাদের সাথে ক্রীতদাস-দের যুদ্ধ চলে। পরে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। পরাজিত ক্রীত-দাসদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলে। রোমের একটি রাস্তার পাশে প্রায় ছয় হাজার বিদ্রোহীকে প্রকাশ্যে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

জুলিয়াস সীজার :—কার্থেজ ধ্বংসের পর বিজয়ী রোম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের অনেক দেশ জয় করে। এই সমস্ত দেশের মধ্যে ম্যাসিডন, গ্রীস, গল (বর্তমান ফ্রান্স), স্পেন, মিসর ও সিরিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। এইরূপে ক্ষুদ্র রোমনগরী থেকে ধীরে ধীরে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়।

রোমের সাম্রাজ্য স্থাপনের সাথে সাথে রোমের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। সেনেটের দলাদলি ও দুর্নীতিতে এই বিশাল রাজ্যের সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। তাই প্রয়োজন হল এক শক্তিশালী একনায়ক শাসনের। এইভাবেই রোমে একনায়ক শাসনের সৃষ্টি হয়। এইসব এক-নায়কদের মধ্যে জুলিয়াস সীজারের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সীজার ছিলেন একজন জনপ্রিয় রোমান সেনাপতি। তাঁর সংগঠন শক্তিও অপূর্ব। রোমের শাসন ক্ষেত্রে তিনি রাজপদ লাভের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে গল, ইংল্যাণ্ড এবং মিসর জয় করেন। সীজারের ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে রোমে গণতন্ত্রের অবসান ঘটে। সীজারের শাসনে রাজ্যে শান্তি ফিরে আসতে থাকে। কিন্তু সীজারের এই একনায়ক শাসন ও তাঁর জনপ্রিয়তা কিছু লোক সহ্য করতে পারেনি। তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করে সীজারকে হত্যা করে।



জুলিয়াস সীজার

নতুন সাম্রাজ্য :—সীজারের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টো-ভিয়াস্ হলেন প্রকৃতপক্ষে প্রথম রোম সম্রাট। রোমানরা তাঁর নাম দেয় অগাস্টাস বা সর্বময় কর্তা। চুয়াল্লিশ বছর ধরে তিনি রোম সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁর শাসনে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাম্রাজ্যের সকল দেশগুলিই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর সময় রোম নগরী সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, রাস্তাঘাট, স্নানাগার, বাজার, মর্মর মূর্তিতে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে।

অগাস্টাসের মৃত্যুর পর বিভিন্ন প্রকৃতির অনেক সম্রাট রোমের সিংহাসনে বসেন। সম্রাট মার্কাস অরিলিয়াস ছিলেন ভাবুক ও দার্শনিক। সম্রাট ক্যালিগুলা ছিলেন অদ্ভুত ধরনের খামখেয়ালী। আবার নীরো ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর। রোম যখন আগুনে পুড়ছিল তিনি নাকি তখন বীণা বাজাচ্ছিলেন।

রোম সাম্রাজ্যের পতন :—রোমের বিশাল সাম্রাজ্য এবং বিপুল সমৃদ্ধি কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। একের পর এক বিভিন্ন বর্বর জাতি রোম সাম্রাজ্যের ওপর হানা দিতে থাকে। তাদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হতে থাকে। এদিকে রোমের সৈন্যবাহিনীদের মধ্যেও দারুণ দলাদলির সৃষ্টি হয়। কালক্রমে রোম সাম্রাজ্যের রোম নগরী ছাড়াও এশিয়া মাইনরে একটি নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়। সম্রাট কন্স্ট্যান্টাইনের নাম অনুসারে এই রাজধানীর নাম হয় কন্স্ট্যান্টিনোপল্। উত্তর থেকে এক বর্বর জাতি চারশ ছিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দে রোম অধিকার করলে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব :—রোমানরা এশিয়ার যে সমস্ত দেশ জয় করে, তাদের মধ্যে ছিল ইহুদীদের দেশ জুডিয়া। রোমের প্রথম সম্রাট অগাস্টাসের সময় জেরুজালেমের নিকটে বেথেলহেমে ইহুদীদের এক পরিবারে খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে তাঁর জীবনের সব ঘটনা আমরা জানতে পারি।

যীশুর বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যৌবনে তিনি এক নতুন ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে

ঈশ্বরের রাজ্য এবং অহিংসা ও ভালবাসার কথা প্রচার করতে থাকেন। সহস্র সহস্র মানুষ তাঁর বাণীতে আকৃষ্ট হলো এবং তাঁর বাণী গ্রহণ করল।

যীশুখ্রীষ্টের এই প্রেমের বাণীতে সাধারণ লোক মুগ্ধ হলেও, অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর লোকেরা খুব ভয় পেল। তারা তাঁকে গোপনে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। যাজকের দল যীশুকে রোম শাসনের বিরোধী বলে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করল। বিচারে রাজদ্রোহের অপরাধে যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হল।

যশুীখ্রীষ্টের বাণী ছিল অত্যন্ত সহজ ও আন্তরিকতায় পূর্ণ। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন—তোমরা এতদিন শুনেছ দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ। কিন্তু আমি বলি তোমরা দুষ্টেরও প্রতিরোধ করবে না। যে তোমার এক গালে চড় মারবে, তুমি তাকে আর এক গাল বাড়িয়ে দেবে। তোমরা শুনেছ প্রতিবেশীকে ভালবাসার কথা, শত্রুকে হিংসা করবার কথা। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যারা তোমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে, তাদের মঙ্গলের জন্যও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবে।

যীশুর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর প্রধান শিষ্যরা দেশে-বিদেশে তাঁর ধর্মের মহান বাণী প্রচার করতে থাকেন। প্রথমে ধর্ম প্রচার অতি দ্রুত প্রসার লাভ করে। দরিদ্র শোষিত মানুষ দলে দলে খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করে। রোমান সম্রাটরা এই নতুন ধর্ম গ্রহণকারীদের উপর দারুণ অত্যাচার করতে লাগলেন। রোমান সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ান সহস্র সহস্র খ্রীষ্টানকে হত্যা করতে থাকে। যীশুর অনুগামীরা মৃত্যু-বরণ করলেও ধর্ম ত্যাগ করলেন না। পরবর্তী সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। ফলে খ্রীষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র অল্প বাধায় দ্রুত প্রসারলাভ করে।

অনুশীলনী

১। (ক) রোম নগরী কোথায় অবস্থিত ছিল? উপকথার কাহিনী থেকে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(খ) কার্থেজ নগরী কোথায় অবস্থিত ছিল? রোম এবং কার্থেজের মধ্যে কি ভাবে সংঘর্ষ শুরু হল? রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধের নাম কি? মোট কয়টি যুদ্ধ হয়েছিল?

(গ) দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের সেনাপতি কে ছিলেন? তাঁর রোম অভিযানের বর্ণনা দাও। কোন্ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন?

(ঘ) আদি যুগে রোম-সমাজের প্রধান দুটি শ্রেণীর নাম কর। এই শ্রেণী দুটিতে সমাজের কোন্ কোন্ স্তরের লোক ছিল? এদের মধ্যে সংঘর্ষের ফল কি হয়েছিল?

(ঙ) রোমের ক্রীতদাসদের জীবন কিরূপ ছিল? তারা কার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে? এই বিদ্রোহের পরিণাম কি হয়েছিল?

(চ) জুলিয়াস সীজার সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ।

(ছ) রোমানদের আমোদ প্রমোদ কিরূপ ছিল উদাহরণ দিয়ে লিখ।

(জ) প্রথম রোম সম্রাটের সময় রোমের কিরূপ উন্নতি হয়। কিভাবে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়।

(ঝ) যীশুখ্রীষ্ট কে ছিলেন? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়? তাঁর দু' একটি বাণীর উল্লেখ কর।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) রোমের বিরাট এম্পিথিয়েটারটি — নামে পরিচিত। এখানে — দর্শকের বসবাস স্থান ছিল। (খ) সীজারের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র — হলেন প্রথম রোম সম্রাট। রোমানরা তার নাম দেয় —। (গ) রোমের দ্বিতীয় রাজধানী — স্থাপিত হয়। রোমান সম্রাট — নাম অনুসারে এই নগরীর নাম হয় —। (ঘ) রোমান সম্রাট — সহস্র সহস্র খ্রীষ্টানকে হত্যা করেন। সম্রাট — খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন।

(৪) চীন

প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে চীনে ব্রোঞ্জ সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই সভ্যতা কিভাবে গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। কয়েক শ বছর ধরে সমগ্র চীন দেশটি অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যেই আলাদা আলাদা রাজা ছিলেন।

কালক্রমে এই রাজ্যগুলি শাং বংশের সম্রাটরা জয় করে চীনের প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

শাং বংশের শাসন ঃ খ্রীষ্টপূর্ব চোদ্দশ সালে শাং বংশের সম্রাটদের রাজধানী আনইয়াং নামে এক মহানগরীর প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। শাং রাজারা ছিলেন মিসরের ফ্যারাওদের মতই ধর্ম-কর্মের ক্ষেত্রে প্রধান। তাঁদের সময় দেশ ধন সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। শাং সম্রাটরা যতদিন বেঁচে থাকতেন ততদিন অত্যন্ত জাঁকজমক আর আরাম বিলাসের মধ্যে কাটাতেন। মৃত্যুর পর প্রায় তেতাল্লিশ ফুট গভীর মাটির নীচে তৈরী করা সুন্দর সুন্দর ঘরে তাঁদের সমাহিত করা হত। এই ঘরগুলি আবার সুন্দর সুন্দর ছবি এবং কারুকার্যে সাজানো থাকত।

শাং বংশের পর চৌ বংশের রাজারা চীনে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এই বংশের রাজত্বকালেই চীনের মহাজ্ঞানী কন্‌ফুসিয়াসের জন্ম হয়। তাঁর লেখা থেকে চীনের সমাজ জীবনের বহু তথ্য পাওয়া যায়।

যে যুগে কন্‌ফুসিয়াস্ জন্মগ্রহণ করেন, চীন দেশের তখন ঘোর দুর্দিন। উত্তর সীমান্ত থেকে হুন, মঙ্গোল, তুর্ক, তাতার প্রভৃতি যাযাবরের দল বারবার ঐ দেশের ওপর হানা দিতে থাকে। এই সমস্ত বর্বর আক্রমণে চীনদেশ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। চীনের ইতিহাসে এই যুগকে বলা হয় সংশয়ের যুগ। ঐ সময় সাধারণ মানুষের দুর্দশা চরমে ওঠে।

কন্‌ফুসিয়াস্ ঃ খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশ একান্ন সালে কন্‌ফুসিয়াসের চীনের এক সম্ভ্রান্ত দরিদ্র ঘরে জন্ম হয়। ছোটবেলায় তাঁকে খুব দুঃখের মধ্যে চলতে হয়। তিনি লেখাপড়ার কোন সুযোগ পান নি। তিনি পুঁথি স্পর্শ করার প্রথম সুযোগ পান উনিশ বছর বয়সে। মাত্র চার বছরের চেষ্টায় তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। নিজের বাড়ীতেই তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের অধিকাংশ সময়েই মুখে মুখে ইতিহাস, কাব্য এবং ভদ্র আচরণের নীতি-কথা শিক্ষা দিতেন।

এই ধরনের শিক্ষকতা তিনি বেশীদিন ধরে করেন নি। তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চীনের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা তাঁকে বড় বড় রাজ কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু যা সত্য, যা ন্যায় তিনি সে সব নির্ভীকভাবে প্রচার করতেন। ফলে সমস্ত দেশের রাজারা তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। তখন তিনি নানা দেশে জ্ঞানের মশাল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অবশেষে লু প্রদেশের একটি প্রধান শহরে তিনি কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি সেই শহরের সমস্ত মানুষের জীবনযাত্রা নিজের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁর চেষ্টায় ও পরামর্শে ঐ শহর বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবেশী দেশগুলি তাঁর এসব কাজ ভাল চোখে দেখল না। তাঁর বিরুদ্ধে চার দিক থেকে ষড়যন্ত্র শুরু হল। তিনি সেই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। আবার শুরু হল তাঁর যাযাবরের জীবন।



কন্‌ফুসিয়াস্

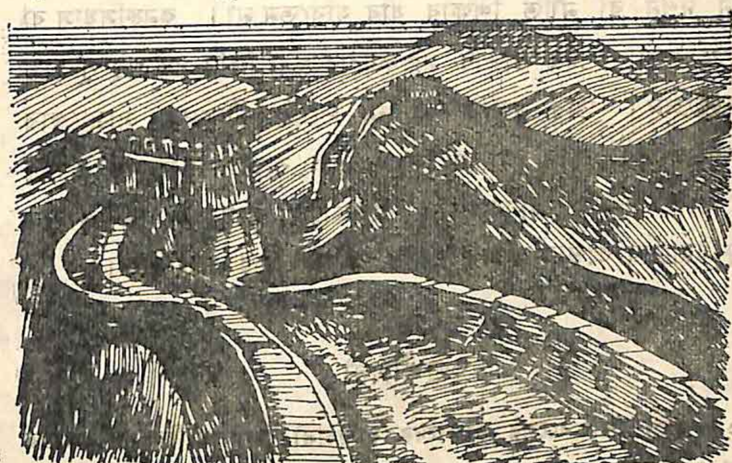
কন্‌ফুসিয়াসের শেষ জীবন সুখের হয় নি। তাঁর কয়েকজন মেধাবী ছাত্রের মৃত্যুতে তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে যায়। নিরাশার গভীর ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কনফুসিয়াসের শিক্ষা : কন্‌ফুসিয়াস্ বিশ্বাস করতেন দুঃখী মানুষের জীবন সুখ ও আনন্দে ভরে তোলা যায়। এরজন্য প্রয়োজন রাজাদের সৎভাবে রাজ্য শাসন করা। কিন্তু সুশাসন প্রজাদের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তিনি মানুষকে সংসার ছেড়ে চলে যেতে বলেন নি। মানুষের দুঃখের কারণ দূর করবার জন্য তিনি চেয়েছিলেন সমাজজীবন উন্নত করতে। মানুষ যদি প্রতিদিনের

জীবনযাত্রায় কতকগুলি সৎ আচরণ অনুসরণ করে, মহৎ ভাবে জীবন যাপন করে, তবেই এই উন্নতি সম্ভব।

বেঁচে থাকতে কন্‌ফুসিয়াস্ তাঁর মতবাদের প্রভাব বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর লোকে তাঁর মতের মর্যাদা দিতে থাকে। প্রাসাদের অধিবাসী থেকে পর্ণ কুটীরের দীনতম মানুষ পর্যন্ত তাদের প্রতিটি বিষয়ে কন্‌ফুসিয়াসের শিক্ষা ও বাণীকে শ্রেষ্ঠ সমাধান বলে মনে করত। তাঁর চরিত্রের মহান্ আদর্শ, সৎ নাগরিকের জীবন যাপনের মহৎ দৃষ্টান্ত—চীনদেশের কোটি কোটি মানুষকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দিয়েছে।

চীন সাম্রাজ্য : খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চীনে তিনটি প্রধান রাষ্ট্র ছিল—চীন, চু এবং চি। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে চীন সবচেয়ে



চীনের প্রাচীর

বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। চীন রাষ্ট্রের রাজা সি হুয়াং তি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি চীনের দক্ষিণ অঞ্চলে অনেক দেশ জয় করেন। এই চীন সম্রাটের শাসনকালে চীন সভ্যতা নানা দিক দিয়ে বিকাশ লাভ করে। সৈন্যদলের চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি সবদিকেই বড় বড় রাস্তা তৈরি করেন। তিনি চীনে একই ধরনের

মুদ্রা চালু করেন, জিনিসপত্রের ওজন ঠিক করে দেন এবং লিপির সংস্কার করেন। চীনদের নাম থেকেই ঐ বিশাল দেশের চীন নাম হয়।

এই সময় চীনের ওপর বর্বর জাতির আক্রমণ চলতে থাকে। এই সমস্ত আক্রমণকারীরা মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি থেকে এসে উত্তর-পশ্চিম দিকে আক্রমণ করত, সি হুয়াং তি বারবার এদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাদের আক্রমণের পথ চিরতরে বন্ধ করবার জন্য তিনি বিখ্যাত **চীনের প্রাচীর** নির্মাণ শুরু করেন। পিকিং নগরীর উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে এই প্রাচীরটি দেড় হাজার মাইল বিস্তৃত।

সি হুয়াং তি রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করেন। তিনি দর্শন বা নীতি শিক্ষার ধার ধারতেন না। কন্‌ফুসিয়াস্ বা অন্যান্য দার্শনিকদের প্রভাব নষ্ট করবার জন্য তিনি সব গ্রন্থ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই চীনদের সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। হান্ নামে নতুন এক রাজবংশ চীনের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে। হান্‌বংশের রাজত্বকালে চীনের সমাজ জীবনে কন্‌ফুসিয়াসের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ভাবে বিস্তার লাভ করে।

অনুশীলনী

১। (ক) শাং বংশের রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল। মিসরের ফ্যারাওদের ক্ষমতার সাথে শাং রাজাদের ক্ষমতার কিরূপ সাদৃশ্য ছিল? শাং রাজাদের সমাধির বর্ণনা দাও।

(খ) কন্‌ফুসিয়াসের জন্মের সময় চীনের অবস্থা কিরূপ ছিল? কন্‌ফুসিয়াসের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(গ) কন্‌ফুসিয়াসের শিক্ষা ও মতবাদ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(ঘ) চীন দেশের নাম কিভাবে হয়েছে। প্রথম চীন সম্রাটের নাম কি? তাঁর রাজত্বকালে চীনের কি পরিবর্তন ঘটেছিল? তাঁর একটি বিশেষ কীর্তির বর্ণনা দাও।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) শাং বংশের পর — রাজারা চীনে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। (খ) কন্‌ফুসিয়াস্ — প্রদেশের একটি প্রধান শহরে কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। (গ) চীন রাষ্ট্রের রাজা — সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। (ঘ) চীনের প্রাচীর — মাইল বিস্তৃত। (ঙ) দার্শনিকদের প্রভাব নষ্ট করবার জন্য চীন সম্রাট সব গ্রন্থ — দেন।

(৫) ভারত

ভারতের সিন্ধু সভ্যতা ছিল তাম্র ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই সভ্যতার অবসান হয়। আর প্রায় সেই সময়েই ভারতে আবির্ভাব ঘটে—আর্যজাতির।

আর্য নামটি কিন্তু কোন বিশেষ জাতির নাম নয়। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হয়েছে একটি আদি ভাষা থেকে। এই আদিভাষায় এক সময় যারা পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করত, তাদেরই বলা হয় আর্য। আর্যভাষীরা নানা শাখায় বিভক্ত ছিল। এদের একটি বড় গোষ্ঠী মধ্য এশিয়ায় বসতি স্থাপন করে। তাদেরই একটি শাখা ভারতে আসে। তারা প্রথমে সপ্তসিন্ধু অঞ্চল অর্থাৎ আফগানিস্থানের কিয়দংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

মেষ চারণ গো-পালনই ছিল আর্যদের প্রধান জীবিকা। হয়ত সামান্য কিছু কৃষি কাজও তারা জানত। এক জায়গার পশুর খাবার ফুরিয়ে গেলে তাদের অন্য জায়গায় যেতে হত। সেইজন্য তারা ছিল আধা যাযাবর। তারা লোহার ব্যবহার জানত। লোহার তৈরী ধারাল আর তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাদের হাতিয়ার। আর তাদের বাহন ছিল দ্রুতগামী অশ্ব।

আর্যদের আগমন ঃ—আর্য অশ্বারোহীর দল একদিন তীর বেগে নেমে এসেছিল ভারতের মাটিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে। তাদের পিঙ্গল চুল আর নীল চোখে সেদিন ছিল রক্ত-ক্ষুধার উন্মাদনা।

তাদের সেই প্রচণ্ড গতিবেগ আর তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আক্রমণ সহ্য করবার মত শক্তি ছিল না স্থানীয় মানুষদের—যাদের সম্বল ছিল তাম্র আর ব্রোঞ্জের অস্ত্র, আর বাহন ছিল বলদ, মহিষ আর হাতীর মত ধীরগতির পশু। আর্যদের আক্রমণে একের পর এক নগরগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। এই নগর অর্থাৎ পুরগুলি ধ্বংসের কাজে সাহায্য করেন আর্যদেবতা ইন্দ্র। তাই তাঁর আর একনাম পুরন্দর। স্থানীয় একজন রাজা শম্বরের শত শত দুর্গও তিনি ধূলিসাৎ করেন। আর এইসব দুর্গ আর নগরীর সব কটিই ছিল সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে।

ভারতে আর্যদের আগমন একই সাথে বা একবারে হয় নি। তারা বিভিন্ন সময়ে দলে দলে ভারতে এসেছিল। সেই কারণেই তাদের নিজেদের মধ্যে রেষারেষি আর যুদ্ধ বিগ্রহ চলত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রথমে আর্যদের বসতি গড়ে ওঠে। গ্রাম পত্তন করে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। চাষবাসেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে তারা প্রথমে মধ্য ভারত, তারপর দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের এই অভিযানে বহুস্থানে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে।

বেদ :—আর্যদের সম্বন্ধে এত কথা আমরা কিভাবে জানতে পারি? তাদের সময়কার কোন ধ্বংসস্তূপ, লিপি বা অনুরূপ কিছু পাওয়া যায় নি। কিন্তু তাদের একটি গ্রন্থ ছিল। তার নাম বেদ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদের চারটি ভাগ—ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। এছাড়াও এইগুলিকে ভিত্তি করে আরো অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছিল। আর্যরা প্রথমে কিন্তু লিখতে জানত না। মুখে মুখে বংশ এবং শিষ্য পরম্পরায় এই বিরাট বেদ এবং বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল। এই বেদ এবং বৈদিক সাহিত্যই আর্য ইতিহাসের প্রধান উৎস।

সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি :—প্রথমে আর্য সমাজের মধ্যে প্রধান দুটি ভাগ ছিল। একটি ভাগে ছিল গৌরবর্ণের বিজয়ী আর্য আর একটি ভাগে ছিল বিজিত কৃষ্ণকায় মানুষ। পরে আর্যদের মধ্যেই

পেশা বা বৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল ধর্মকর্ম পরিচালনা করা এবং বিদ্যা শিক্ষাদান করা। ক্ষত্রিয়েরা দেশের শাসন কাজ ও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনা করতেন। বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাষবাসের কাজ নিয়ে থাকতেন। প্রথম প্রথম এই তিন বর্ণের মধ্যে বৃত্তির ব্যাপারে কোনরূপ বাধা নিষেধ ছিল না। পরে কিন্তু এই বৃত্তিগুলি জন্মগত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কাজ ছাড়া ইচ্ছামত কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারত না। আর বিজিত কৃষ্ণকায় মানুষকে আর্যরা বলত দাস বা দস্যু। সমাজের সবচেয়ে নীচু স্তরে তাদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। তাদের বলা হত শূদ্র। সমাজের উঁচু স্তরের তিন বর্ণের সেবা করাই ছিল তাদের কাজ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের আর্যদের জীবন চারিটি আশ্রম বা ভাগে বিভক্ত ছিল। এই চারটি আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করত। গার্হস্থ্যাশ্রমে তারা বিয়ে করে সংসার করত। বেশী বয়সে তারা বানপ্রস্থাশ্রমে নির্জনে ধর্ম সাধনা করত। সন্ন্যাসাশ্রমে তারা সংসারের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের চিন্তায় বিভোর থাকত।

বৈদিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা সব সময়ই এক রকম ছিল না। ঋক্ বেদের যুগে যা প্রচলিত ছিল, অথর্ব বেদের সময়ে তার অনেক পরিবর্তন ঘটে।

বৈদিক আর্যদের সমাজ-জীবন পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পরিবারের কর্তা ছিলেন গৃহপতি। কয়েকটি পরিবারকে নিয়ে গ্রাম এবং কতকগুলি গ্রাম নিয়ে বিশ বা জন গঠিত হয়। গ্রামের প্রধান ছিলেন বিশপতি বা রাজন। সমাজে রাজা ছিলেন সকলের প্রধান। রাজারা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজত্ব করতেন। সময় সময় আবার সাধারণ মানুষ রাজা নির্বাচন করত। পরাজিত শত্রু ও প্রজাদের কাছ থেকে রাজা কর আদায় করতেন।

ধর্মসংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য রাজা একদল গুণী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতেন। এদের বলা হত পুরোহিত। পুরোহিতরা ধর্ম সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও রাজকার্যে রাজাকে পরামর্শ দিতেন।

চারটি বেদের মধ্যে ঋক্‌বেদ সবচেয়ে আগে রচিত হয়। এই বেদের মন্ত্রে প্রকৃতির শক্তিকে দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। যেমন আকাশের দেবতা ছিলেন বরুণ বজ্রের দেবতা ইন্দ্র এবং ঝড়ের দেবতা মরুৎ। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বা নিজেদের কল্যাণের জন্য তারা এইসব দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করত। প্রথম দিকে তারা স্তবস্তুতির দিকেই জোর দেয়। কিন্তু পরে যাগযজ্ঞ ও নানারকম ক্রিয়াকাণ্ডের দিকে তাদের ঝোঁক বাড়ে। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রথমে ছিল সরল। দেবতাদের উদ্দেশ্যে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ঘি, দুধ, শস্য, সোমরস প্রভৃতি অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত। ক্রমে যাগযজ্ঞ প্রণালী জটিল হয়ে ওঠে। সমজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ক্ষমতা বেড়ে যায়।

বেদের শেষ অংশের নাম উপনিষদ। উপনিষদ সমূহে আত্মা ও ব্রহ্ম প্রভৃতি বিষয়ে গভীর আলোচনায় পূর্ণ। উপনিষদে আলোচিত তত্ত্বগুলি থেকেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি। ঐ যুগে বিদ্যার্থীরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করত। উপনিষদ থেকে জানা যায় ঋষি বালক নচিকেতা অনেক কষ্ট সহ্য করে যমের কাছে গিয়ে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ত্যাগের পূর্বে তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে অনেক ধনরত্ন দান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী ধন-সম্পদের লোভ ত্যাগ করে বিদ্যালাভের জন্য স্বামীর কাছে প্রার্থনা করেন। উপনিষদের যুগে মানুষ ছিল সরল, নিরহঙ্কার এবং জ্ঞানপিপাসু।

মহাকাব্য :—বৈদিক যুগের শেষের দিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ দুটি মহাকাব্য – রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়। এই দুটি মহাকাব্য থেকে তখনকার সমাজ ও সভ্যতার মোটামুটি একটি পরিচয় পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বাস

করত। ধীরে ধীরে তারা সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পরে। দক্ষিণ ভারতে ভারতের এক প্রাচীন জাতি দ্রাবিড়রা বাস করত। রামায়ণের যুগে আর্যরা দক্ষিণ ভারত ও লঙ্কা জয় করে। এই সমস্ত অঞ্চলে কৃষিকাজের প্রবর্তন ঘটে। মহাভারত থেকে আমরা আর্য রাজাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের কথা জানতে পারি। এই সময় কোন একজন রাজা অন্য রাজাদের পরাজিত করে রাজচক্রবর্তী উপাধি ধারণ করতেন। রাজারা রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের সাথে একদল সৈন্য থাকত। যে সমস্ত রাজ্যের মধ্য দিয়ে বিনা বাধায় এই অশ্ব যেত, সেইসব রাজ্য এই রাজার অধীন বলে গণ্য করা হত। শেষে ঐ বিজয়ী অশ্ব ফিরে এলে তাকে কেটে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হত। রাজসূয় যজ্ঞে সকল অধীন রাজাদের নিমন্ত্রণ করা হত। Superstition.

বৈদিক যুগের শেষের দিকে ধর্মের ক্ষেত্রে যাগযজ্ঞ, পশুবলি প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠান বেড়ে যায়। সমাজে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিভেদের কড়াকড়ি সমাজকে পঙ্গু করে ফেলে। মানুষের মন তখন সহজ, সরল ও অনুষ্ঠানশূন্য ধর্মপালনে উন্মুখ হয় ওঠে।

ভারতের মানুষের মনের এই অবস্থায় একদল মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের লক্ষ্য হয় এক সহজ, সরল ও জাঁকজমক-হীন ধর্মমত প্রবর্তন করা। এই মহাপুরুষদের মধ্যে মহাবীর ও বুদ্ধদেবের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মের নাম জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম :—মহাবীর উত্তর বিহারের বৈশালী নগরের কাছে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। বার বৎসর কঠোর সাধনার পর তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করেন। ত্রিশ বছর ধরে ধর্ম প্রচার করবার পর বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মহাবীর প্রচারিত ধর্মের সারমর্ম হল—সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসা পালন, সত্যবাদিতা ও পবিত্র জীবন যাপন। অতি কঠোর ভাবে অহিংসা পালন এবং উপবাস প্রভৃতির দ্বারা কৃচ্ছ্র সাধন -মহাবীরের মূল উপদেশ ছিল। মহাবীর প্রবর্ত্তিত ধর্মের নাম জৈনধর্ম। কালক্রমে জৈনরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর নামে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।



মহাবীর

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবের বাল্যকালের নাম ছিল সিদ্ধার্থ ও গৌতম। তিনি ছিলেন নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তুর মহানায়ক শুদ্ধোদনের পুত্র। বাল্যকাল থেকেই সংসারে তাঁর মন বসত না। সংসারে কেবল দুঃখের জ্বালা দেখে দেখে তাঁর মন অস্থির হয়ে ওঠে। তিনি চিন্তা করতেন কিভাবে মানুষ রোগ, জরা এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। উনত্রিশ বছর বয়সে এক গভীর রাত্রে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। নানাস্থানে তিনি ঘু'রে বেড়ালেন, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। নির্জনে অনেকদিন ধরে তপস্যা করলেন। অনাহারে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল। তবু তিনি মুক্তির সন্ধান পেলেন না। পরে তিনি গয়ার কাছে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় ধ্যানে বসলেন। কিছুদিন ঐ স্থানে গভীর ধ্যান করবার পর তিনি মুক্তির পথের সন্ধান পেলেন। এই পরমজ্ঞান বা বোধি লাভ করবার পর তাঁর নাম হল বুদ্ধ। প্রথমে তিনি বারানসীর মৃগদাবে পাঁচজনকে ধর্মের উপদেশ দান করেন।

বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। তাঁর মতে মানুষ যেমন কাজ করে তেমন ফল ভোগ করে। মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে

নিজের ওপর, কোন দেবদেবীর ওপর নয়। এই জন্মে যে সৎ কাজ করবে পরজন্মে তার আরও উন্নতি হবে। এইভাবে জন্ম-জন্মান্তরে উন্নতি করতে করতে মানুষ একদিন নির্বাণ লাভ করবে। তাকে আর এই পৃথিবীতে আসতে হবে না। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা আর ভোগ করতে হবে না। বুদ্ধের ধর্মমতে যেমন সংসার ছেড়ে গিয়ে তপস্যার কথা নেই, তেমনি আবার সংসারে থেকে ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে থাকবার কথাও বলা হয়নি। তিনি মানুষের জন্য অষ্টমার্গ বা আটটি পথের কথা বলেন। এইগুলি পালনের মধ্য দিয়েই মানুষের মন হবে পবিত্র এবং মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। এ ছাড়াও তিনি তাঁর শিষ্যদের পঞ্চশীল বা পাঁচটি নৈতিক উপদেশ দিতেন। এগুলির মধ্যে ছিল হিংসা না করা, মিথ্যা কথা না বলা প্রভৃতি।



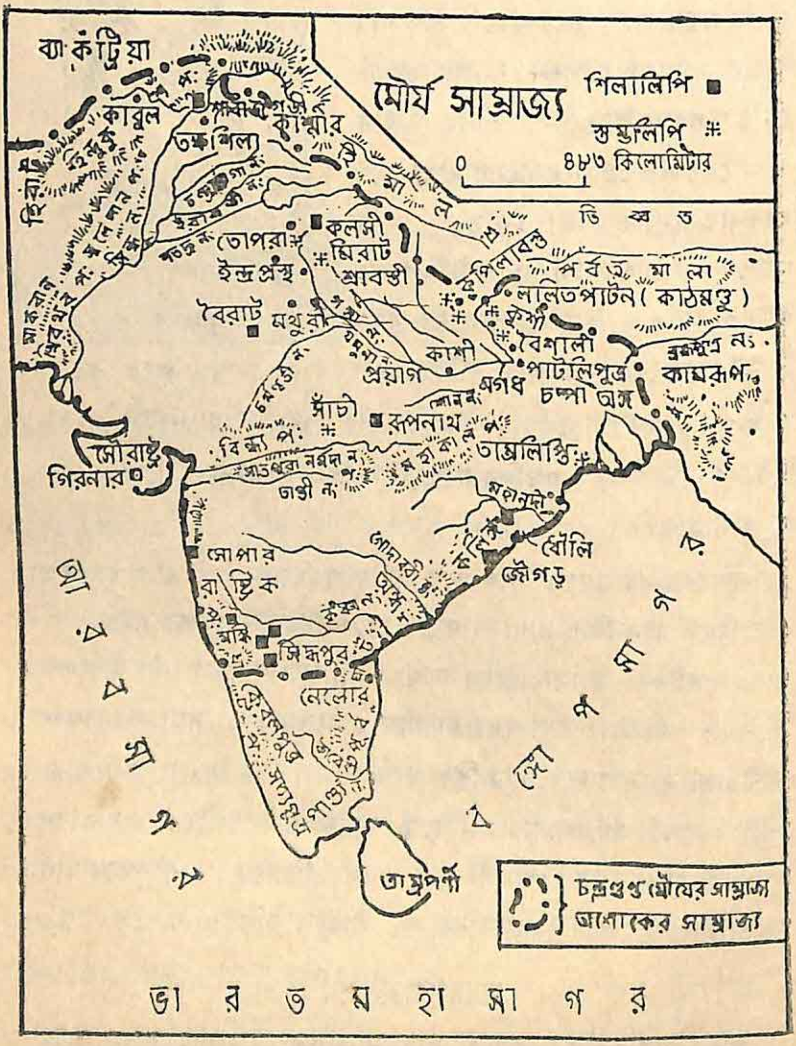
বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেব ধর্ম সম্বন্ধে মুখে মুখে উপদেশ দিতেন। তিনি কোনও গ্রন্থ লিখে যান নি। সাধারণ মানুষ যাতে তাঁর উপদেশের মর্ম বুঝতে পারে সেইজন্য জনসাধারণের কথ্য ভাষা পালিতে তিনি উপদেশ দিতেন। তিনি জাতিভেদের ব্যবধান মানতেন না। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ দলে দলে তাঁর শিষ্য হতে লাগল। মগধরাজ বিম্বিসার, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ, আবার সারিপুত্ত, আনন্দ ও উপালীর মত সাধারণ স্তরের মানুষও তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন। এইভাবে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ধর্মপ্রচারের পর তাঁর পরিনির্বাণ বা মৃত্যু হয়।

সাম্রাজ্যের পর্ব

মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের সময় মগধ এবং কোশল নামে উত্তর ভারতে দুইটি বড় রাজ্য ছিল। পরে মগধের ক্ষমতা বেড়ে যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে নন্দবংশের রাজারা পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও সিন্ধু ছাড়া সারা উত্তর ভারতে মগধের অধিকার বিস্তৃত করেন। মগধের শক্তি ও সমৃদ্ধির কথা জানতে পেরে আলেকজাণ্ডারের গ্রীক বাহিনী ভারতে আর এগুতে চায় নি।



মৌর্য সাম্রাজ্য :— নন্দবংশের রাজা সাধারণ প্রজাদের প্রিয় ছিলেন না। আলেকজাণ্ডারের ভারত ত্যাগের পর মৌর্য বংশের এক

যুবক নন্দবংশ ধ্বংস করে মগধের সিংহাসনে বসেন। এই যুবকের নাম চন্দ্রগুপ্ত। তিনিই ভারতব্যাপী প্রথম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

চন্দ্রগুপ্ত অসামান্য বীর ছিলেন। তিনি পাঞ্জাব থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। বর্তমান আফগানিস্তানের কিছু অংশ চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে দিয়ে সেলুকাস সন্ধি করেন। উত্তর পশ্চিমে বর্তমানের আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণে তামিল দেশের তিনেভেলি জেলা ও মহীশূর পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজকাজের উপদেষ্টা ছিলেন কৌটিল্য বা চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণ। জৈনশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত শেষ বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময় মৌর্য সাম্রাজ্য অটুট থাকে। বিন্দুসারের পর তাঁর পুত্র অশোক সম্রাট হন। প্রথমে কয়েক বছর অশোক অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করেন। দক্ষিণ উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর অংশে কলিঙ্গ নামে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। অশোক ঐ রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে দেড় লক্ষেরও বেশী সৈন্য বন্দী এবং এক লক্ষ সৈন্য নিহত হয়, কলিঙ্গরাজ্য শ্মশানে পরিণত হয়।


অশোক

পৃথিবীতে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ জয়ের পর পরাজিত মানুষের বেদনায় আর ক্রন্দনে কোন সম্রাট বা সেনানায়কের মনে অশোকের মত এমন গভীর অনুশোচনা আসে নি। কলিঙ্গ যুদ্ধই তাঁর জীবনে শেষ যুদ্ধ। বুদ্ধের অহিংসা ও মানুষের কল্যাণের পথে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তিনি প্রজাদের সৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাহাড় এবং স্তম্ভের গায়ে নানা উপদেশ



মৌর্য সাম্রাজ্য :— নন্দবংশের রাজা সাধারণ প্রজাদের প্রিয়
লেন না। আলেকজাণ্ডারের ভারত ত্যাগের পর মৌর্য বংশের এক

ছেড়ে দিয়ে সেলুকাস সন্ধি করেন। উত্তর পশ্চিমে বর্তমানের আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণে তামিল দেশের তিনেভেলি জেলা ও মহীশূর পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজকাজের উপদেষ্টা ছিলেন কৌটিল্য বা চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণ। জৈনশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত শেষ বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময় মৌর্য সাম্রাজ্য অটুট থাকে। বিন্দুসারের পর তাঁর পুত্র অশোক সম্রাট হন। প্রথমে কয়েক বছর অশোক অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করেন। দক্ষিণ উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর অংশে কলিঙ্গ নামে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। অশোক ঐ রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে দেড় লক্ষেরও বেশী সৈন্য বন্দী এবং এক লক্ষ সৈন্য নিহত হয়। কলিঙ্গরাজ্য শ্মশানে পরিণত হয়।



অশোক

পৃথিবীতে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ জয়ের পর পরাজিত মানুষের বেদনায় আর ক্রন্দনে কোন সম্রাট বা সেনানায়কের মনে অশোকের মত এমন গভীর অনুশোচনা আসে নি। কলিঙ্গ যুদ্ধই তাঁর জীবনে শেষ যুদ্ধ। বুদ্ধের অহিংসা ও মানুষের কল্যাণের পথে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তিনি প্রজাদের সৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাহাড় এবং স্তম্ভের গায়ে নানা উপদেশ

উৎকীর্ণ করান। তাঁর প্রচেষ্টায় বুদ্ধের বাণী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়।

মৌর্যদের পর উত্তর ভারতে সুঙ্গ ও কাণ্ববংশ এবং অন্ধ্রদেশে সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এই সব রাজ্য ভাঙ্গা গড়ার পালা শেষ হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পর পাঁচশ বছরের মধ্যে কোন বড় রকমের সাম্রাজ্য ভারতে গড়ে ওঠে নি। এই সময়ের মধ্যে উত্তর পশ্চিম ভারতে গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি একটির পর একটি রাজ্য গড়ে তোলে। এদের মধ্যে কুষাণরাই উত্তর ভারত ও এশিয়ার অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

কুষাণরা ছিল মধ্য এশিয়ার একদল মানুষ। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তাঁর সাম্রাজ্য কাশ্মীর থেকে বিহার পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের এবং ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি পহ্লব ও চীনাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে রাজধানী পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার), তক্ষশীলা, মথুরা, কাশ্মীর প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরী ছিল।

কণিষ্ক একটি অব্দ প্রবর্তন করেন। এই অব্দই প্রসিদ্ধ শকাব্দ। আটাত্তর খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর অভিষেকের স্মারক রূপে তিনি এই অব্দের প্রচলন করেন। কিন্তু সকলে এইমত গ্রহণ করেন নি।

কণিষ্কের মৃত্যুর পর কুষাণ সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। সারা ভারত ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়। একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের মধ্যে এই অবস্থার অবসান হয়। এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে ভারতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। এই নতুন রাজবংশের নাম গুপ্তবংশ।

গুপ্ত সাম্রাজ্য :— খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষের দিকে এই বংশের রাজা চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন, তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ

করেন। তাঁর অভিষেকের সময় থেকে একটি অব্দের গণনা শুরু হয়। এই অব্দ গুপ্তাব্দ নামে পরিচিত। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য পশ্চিমে এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজ্যের রাজধানী।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত রাজা হন। তিনি বহু রাজ্য বিজয়ী বীর ছিলেন। তাঁর রাজ্য বিজয়ের কাহিনী এলাহাবাদের একটি স্তম্ভের গায়ে খোদিত আছে। ঐ লিপি রচনা করেন সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ। ঐ লিপি থেকে জানা যায় সমুদ্রগুপ্ত অসাধারণ সমর-কুশলী ছিলেন। বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি ক্ষুদ্র গুপ্ত রাজ্যটিকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।



সমুদ্রগুপ্ত

তাঁর সাম্রাজ্য বঙ্গদেশ থেকে পাঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের অনেক গণতান্ত্রিক দেশ থেকেও তিনি কর আদায় করতেন। দক্ষিণ ভারতে তাঁর বিজয় বাহিনী কাঞ্চিনগর পর্যন্ত পৌঁছেছিল। দক্ষিণের বার জন রাজাকে তিনি পরাজিত করেন। পরাজিত রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলে তিনি তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। পশ্চিম অঞ্চলের শক ও কুষাণ রাজারা স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন নামে স্বাধীন। তাঁরা নানাভাবে সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করেন। সুদূর সিংহল ও ভারত মহাসাগরের অন্যান্য অনেক দ্বীপে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি তাঁর পিতার মতই বীর যোদ্ধা ছিলেন। গুজরাটে প্রায় তিনশ বছর ধরে শক রাজারা রাজত্ব করতেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকবংশের

শেষ রাজা রুদ্রসিংহকে পরাজিত করেন। তিনি মালব জয় করে উজ্জয়িনীতে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে একটি লৌহস্তম্ভ আছে। স্তম্ভের লিপি থেকে জানা যায় যে চন্দ্র নামে এক রাজা বঙ্গদেশে এক বাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি যুদ্ধ করতে করতে হিন্দুকুশের অপর পারের বহ্লকি পর্যন্ত অগ্রসর হন। অনেকে মনে করেন এই চন্দ্র রাজাই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময় গুপ্তসাম্রাজ্য অটুট থাকে। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁর রাজত্বের শেষভাগে রাজপুতানার পুষ্যমিত্র নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। কুমার-গুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত বহুদিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পুষ্যমিত্রদের পরাজিত করেন।

কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত গুপ্তসম্রাট হন। তাঁর রাজত্বের শেষ ভাগে বর্বর হূনজাতি জাতি গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত তাদের পরাজিত করেন। পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে কাথিয়াবাড় পর্যন্ত ভূভাগের ওপর স্কন্দগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসন ছিল।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্তসাম্রাজ্য বেশীদিন অটুট থাকেনি। দেশী বিদেশী বিভিন্ন শক্তি ভারতের নানা স্থানে নতুন নতুন স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ভারত ইতিহাসে আদি পর্বে মৌর্য ও গুপ্ত-সাম্রাজ্যের মত ভারত জোড়া এত বড় সাম্রাজ্য আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

প্রাচীন বাংলা

মাটি ও মানুষ নিয়েই দেশ। মাটির বুকেই মানুষ ঘর বাঁধে, চাষ আবাদ করে। দল বেঁধে বাস করতে করতে তারা গ্রাম, গঞ্জ, নগর গড়ে তোলে। সভ্যতার ধাপে ধাপে মানুষ তার দেশের একটি সীমানা ঠিক করে নেয়। নানা কারণে এই সীমানা কখনও বাড়ে, আবার কখনও কমে আসে।

সুদূর অতীতে বাংলার ইতিহাস কিন্তু বর্তমানের পশ্চিম বাংলা বা বাংলাদেশের ইতিহাস নয়। তখন বাংলা ভাষী অঞ্চলের পরিধি ছিল অনেক বড়। বর্তমানের বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম রাজ্যের অনেকখানি নিয়ে ছিল প্রাচীন বাংলা। সে সময় বাংলা ভাষী এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম বাংলা ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র ; পশ্চিমবঙ্গে সুহ্ম, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত ; দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। এছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলের নাম ছিল গৌড়। মুসলমান রাজত্বকালেই এইসব অঞ্চলগুলি সর্বপ্রথম একত্রে বাংলা নামে পরিচিত হয়।

বাংলা অতি প্রাচীন দেশ। আর্যদের ভারতে আসবার অনেক আগেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের বসতি ছিল। কিন্তু আর্যদের কাছে এই দেশ ছিল অজ্ঞাত। সেই কারণেই আর্যদের প্রাচীনতম বেদ ঋক্‌বেদে বাংলা বা বাংলার অধিবাসীদের কোন উল্লেখ নেই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গজাতিকে পক্ষীকল্প বলা হয়েছে। অর্থাৎ পাখীর ভাষা মানুষ বুঝতে পারে না, আর্যরাও তেমনি প্রাচীন বাংলার লোকদের কথা বুঝতে পারত না। সেইজন্য বৈদিক সাহিত্যে তাদের পাখী বলা হয়েছে।

কালক্রমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। রামায়ণে বঙ্গের ঐশ্বর্যের কথা আছে। বাংলার লোকেরা অযোধ্যার রাজার অধীনতা স্বীকার করেছিল। মহাভারতে করতোয়া নদীর তীর ও গঙ্গাসাগর সঙ্গম পবিত্র তীর্থরূপে বর্ণিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ভীম দিগ্বিজয়ে বের হয়ে বঙ্গের রাজা সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাজিত করেন। পৌণ্ড্রের অধিপতি বাসুদেব ও সমুদ্র-তীরবাসী ম্লেচ্ছরা তাঁর কাছে পরাজিত হয়।

জৈনদের একটি প্রাচীন গ্রন্থে সুহ্ম ভূমির উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীর রাঢ় দেশে আসেন। জৈন সাহিত্যে এই রাঢ় দেশ অতি দুর্গম এবং এখানকার অধিবাসীদের

অত্যন্ত বর্বর ও নিষ্ঠুর বলা হয়েছে। একটি বৌদ্ধ গ্রন্থে পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্মের লোকদের অসুর বলা হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলার উল্লেখ অনেক স্পষ্ট। গ্রীক ও লাতিন লেখকরা এই সময় আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান সম্পর্কে অনেক কথা লিখে গিয়েছেন। তাঁদের লেখা থেকে জানা যায় যে, বিপাসা নদীর পূর্ব তীরে দুইটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল, একটি প্রাচ্য অপরটি গঙ্গারাষ্ট্র। প্রাচ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র আর গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী গঙ্গানগর। এই গঙ্গানগরীটি ছিল ভাগীরথীর পূর্ব তীরে। পরে এই দুটি রাষ্ট্র এক রাজার অধীন হয়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ এবং শিলালিপি থেকে এই তথ্য জানা যায়। ঐ সময় গঙ্গানগরী অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় সম্রাট অশোক পুণ্ড্রবর্ধনে একজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। কুষাণ যুগের কিছু স্বর্ণ ও অন্য ধাতুর মুদ্রা বাংলার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে।

চীন দেশের একজন পর্যটকের লেখা থেকে জানা যায় যে গুপ্ত-বংশের আদি পুরুষ শ্রীগুপ্ত পুণ্ড্রবর্ধনে রাজত্ব করতেন। সমুদ্রগুপ্ত সমতট ছাড়া প্রাচীন বাংলার প্রায় সকল জনপদ জয় করেছিলেন। সমতটের রাজাও তাঁকে কর দিতেন। লৌহস্তম্ভের শিলালিপি থেকে জানা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গের এক বাহিনীকে পরাজিত করেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। বাংলায় গুপ্তরাজত্বের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন।

বিদেশের সাথে সংযোগ : ভারতের তিন দিকে সমুদ্র। উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালা। সমুদ্রের বিশাল জলরাশি এবং উত্তরের পর্বত প্রাচীরের জন্য অন্য দেশের সাথে সহজে ভারতের যোগাযোগ হতে পারত না। কিন্তু ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে গিরিপথ দিয়ে হাঁটা পথে এবং পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব দিকে জলপথে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সুদূর অতীত থেকে ভারতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

প্রথমে সিন্ধু-উপত্যকার লোকেরা নানাভাবে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। মেসোপটেমিয়ায় আক্কাদে ভারতীয় বণিকদের একটি উপনিবেশ গড়ে ওঠে। পরে লৌহযুগে ভারতের বিদেশের সাথে সংযোগ বেড়ে যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পারস্য সম্রাট কাইরাস সিন্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চল পারস্য সাম্রাটের অধীন করে নেন। কিন্তু খুব বেশীদিন পারস্যের প্রভুত্ব স্থায়ী হয়নি।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণে ভারত ও গ্রীকদের মধ্যে প্রথম সংযোগ ঘটে। ঐ সময় থেকে বহুদিন ধরে পাঞ্জাব এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গ্রীকদের বসতি গড়ে ওঠে। পরে মধ্য এশিয়া থেকে শক, কুষাণ, হুন প্রভৃতি জাতির মানুষ ভারত আক্রমণ করে। ভারতের অনেক স্থানে তারা রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

এই সব বিদেশীদের সাথে ভারতীয়দের সংযোগের ফলে একদিকে যেমন ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে যায় আবার ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা বিদেশে প্রচারিত হয়। এই সংযোগের ফলে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়।

ভারতে গ্রীকদের রাজত্বকালে পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ খুলে যায়। শক, কুষাণদের সময় মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে ভারতের বাণিজ্য বেড়ে যায়। মশলাপাতি ও নানা রকম সৌখিন বিলাস দ্রব্যের জন্য রোমান ব্যবসায়ীরা ভারতে আসে। ভারতের বণিকরাও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে। মধ্য এশিয়ার চীনের সঙ্গেও ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য হতে থাকে। কুষাণদের রাজত্বকালে ভারত-চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

মধ্য এশিয়া এক বিস্তৃত অঞ্চল এক সময়ে সারা মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ঘটে। এইসব অঞ্চলের মধ্যে খোটান, ইয়ারখন্দ, সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রবাদ আছে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে উত্তর পশ্চিম ভারতের একদল লোক খোটান প্রতিষ্ঠা করে। খোটানে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও খোটানী

ভাষায় লিখিত অনেক হাতে-লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে খোটানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠায় ঐ সব অঞ্চলের গ্রীক, শক, কুষাণ ও হূণগণ সহজেই ভারতীয় হয়ে ওঠে। কণিষ্কের সময় কুষাণ সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পুরোনো ভারতীয় উপনিবেশগুলি আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এইসব স্থানে মঠ, বিহার ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, হিন্দু দেবদেবী, বুদ্ধ মূর্তি, সংস্কৃত ও পালিভাষায় লেখা অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে।

বিদেশের সাথে সংযোগের ফলে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতিতেও কিছু পরিবর্তন ঘটে। মৌর্য যুগের স্তম্ভগুলিতে পারসিকদের প্রভাব দেখা যায়। গ্রীক রাজাদের সময় রাজমূর্তি এবং অন্যান্য মূর্তি ও চিহ্ন আঁকা প্রচুর মুদ্রার চল ছিল। কুষাণ যুগে গ্রীক ও ভারতীয় সংস্কৃতির মিলনের বিচিত্র ফল গান্ধার শিল্প। এই শিল্প রীতিতে সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয়।

বিদেশীদের বিবরণে ভারতীয় সমাজ :—প্রাচীন ভারতে অনেক বিদেশী ভারতে আসেন। কেউ আসেন রাজ কাজে, কেউ আসেন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, আবার কেউ বা আসেন তীর্থ দর্শন বা ধর্ম গ্রন্থের সন্ধানে। এইসব বিদেশী পর্যটনকারীদের দু'জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস এবং চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন। সেলুকাসের সাথে যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জয়ী হন। পরে তাঁর রাজধানীতে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস কিছুকাল অবস্থান করেন। ফা-হিয়েন এসেছিলেন গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে। তিনি প্রায় বার বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। এই দুইজন বিদেশী পর্যটক তাঁদের ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন। তাঁদের লেখা থেকে ভারতবাসীর সমাজ জীবন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানতে পারি।

মেগাস্থিনিস :—মেগাস্থিনিসের লেখা থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ ছিল। দেশে খাদ্যদ্রব্য

প্রচুর ছিল। জনসাধারণ ছিল সুস্থ ও সুখী। কৃষি ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। দেশে কখনও দুর্ভিক্ষ ছিল না। জনসাধারণের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল। দেশে চুরি, ডাকাতি বা মামলা মোকদ্দমা একরকম ছিল না বললেই চলে। স্ত্রীলোকেরাও উচ্চ শিক্ষা লাভ করত। কৃষক, কারিগর ও হস্তশিল্পী নিয়ে গঠিত গ্রামীণ সমাজ মোটামুটি আত্মনির্ভর ছিল।

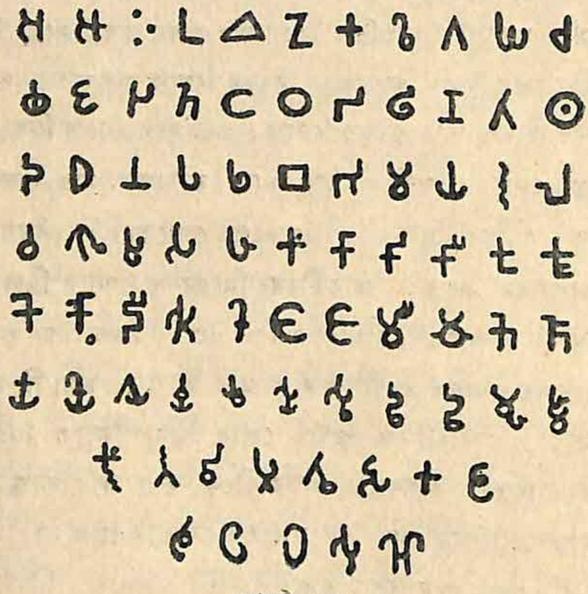
মেগাস্থিনিসের বিবরণে রাজধানী পাটলিপুত্রের সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে। পাটলিপুত্র নগরটির সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য একটি নগর পরিষদ ছিল। আবার মৌর্য সম্রাটের সামরিক বিভাগের জন্যও একটি সংস্থা ছিল।

ফা-হিয়েন :—ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে গুপ্তযুগের ভারতের জনজীবনের অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। ঐ যুগে ভারত ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং ধনধান্যে পূর্ণ। তাঁর মতে ভারতের মত এত সমৃদ্ধ দেশ আর কোথাও ছিল না। এদেশের লোকেরা বিদেশীদের খুবই আদর আপ্যায়ন করত। ভারতীয়রা নিজেদের সম্পদে ছিল তৃপ্ত ও সুখী। তারা রাজাকে কোন কর দিত না। কেবলমাত্র কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের লাভের একটি অংশ রাজার ভাণ্ডারে জমা দিতে হত। দেশের মধ্যে যাতায়াতের ওপর কোন বাধা নিষেধ ছিল না। অপরাধের তারতম্য অনুসারে অপরাধীকে গুরু বা লঘুদণ্ড দেওয়া হত। বাজারে কোন মদ বা মাংসের দোকান ছিল না। কড়ির মাধ্যমে জিনিসপত্র কেনা বেচা হত।

বাংলার তাম্রলিপ্ত একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষা ও বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এই বন্দর থেকে বাঙ্গালী বণিকরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজে চড়ে সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি দূর দূরান্তের দেশে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করত। ধর্মের ব্যাপারে কোন গোঁড়ামী ছিল না।

ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতি :—সভ্যতা কথাটি নিছক একটি শব্দ নয়। মানুষের ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কর্মের মধ্য দিয়েই সভ্যতার বিকাশ ঘটে। প্রাচীন ভারতে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠছিল।

ভাষা ও সাহিত্য :—বর্তমান ভারতের সব ভাষারই মূলে রয়েছে প্রাচীন ভারতের প্রধান দুটি ভাষা গোষ্ঠী—আর্য ও দ্রাবিড়। ভারতীয় আর্যদের ভাষা সংস্কৃত। বহুদিনের ব্যবহারে সংস্কৃত ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটে। সাধারণ মানুষ আবার নানা ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। এগুলিকে বলা হত প্রাকৃত ভাষা। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবির্ভাবে প্রাকৃত ভাষার মর্যাদা বাড়ে। অশোকের শিলালিপিগুলি প্রাকৃত ভাষাতেই খোদিত হত। ঐ সব শিলালিপির



ব্রাহ্মী হরফ

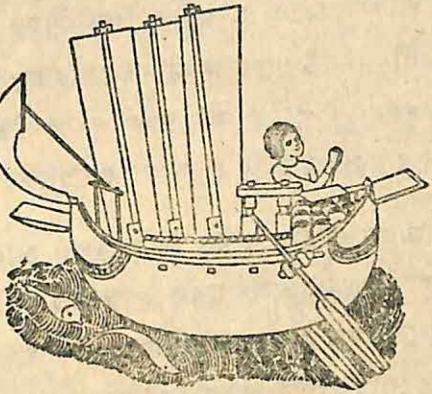
অধিকাংশই লেখা হত ব্রাহ্মী হরফে। এই ব্রাহ্মী হরফগুলি থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার অক্ষরগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষাতেই বেদ এবং বিশাল বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়। এই ভাষাতেই ভারতের দুটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়। প্রথমে লেখার চল ছিল না। এগুলো গাথার আকারে বহু যুগ ধরে মুখে মুখে চলে আসছিল। গুপ্তযুগে এগুলি সংকলিত হয়। গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ভারতে বিখ্যাত নাট্যকাররা নাটক রচনা

শুরু করেন। এইসব নাট্যকারের মধ্যে অশ্বঘোষ, ভাস এবং কালিদাসের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কালিদাস শুধু নাটক রচনা করেন নি। তিনি ছিলেন কবি এবং কয়েকটি সুন্দর কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। 'শকুন্তলা' কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক। তাঁর কাব্য গ্রন্থের মধ্যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি বিখ্যাত। দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় রচিত সঙ্গম সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

শিল্পকলা :—সিন্ধু সভ্যতার অবসানের পর প্রায় এক হাজার বছর পরে ভারতে কোন শিল্পকলার বিকাশ ঘটেনি। মৌর্যযুগে বিভিন্ন স্তম্ভ, স্তূপ, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মিত হয়। কাশীর কাছে সারনাথের স্তম্ভ ও ভূপালের সাঁচী স্তূপ মৌর্য যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন। কুষাণ যুগে গ্রীক, রোম ও ভারতীয় শিল্পকলার মিলনে গান্ধার শিল্প নামে এক শিল্পরীতির বিকাশ ঘটে। এই রীতিতে গ্রীক দেবতাদের অনুকরণে



জাহাজ—অজন্তার চিত্র

সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধ মূর্তি তৈরি হতে থাকে। মথুরা, অমরাবতী প্রভৃতি নগরীগুলিতে ভারতীয় রীতিতে অনেক মূর্তি নির্মিত হত। গুপ্তযুগে বহু দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হয়। এ যুগের মথুরা ও সারনাথের বুদ্ধ মূর্তি এবং দেওগরের দেব-মূর্তিগুলিতে কোন বিদেশী প্রভাব ছিল না। মূর্তি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির স্থাপত্যেরও বিশেষ উন্নতি হয়।

অজন্তার গিরিগুহাগুলি গুপ্তযুগের স্থাপত্য ও চিত্রকলার অপূর্ব

নিদর্শন। এই গুহাগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য তৈরি হয়েছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ শিল্পীদের দক্ষতায় এই গিরিগুহাগুলির ভেতরের অংশ ও দেয়ালগাত্রগুলিতে অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। গুহাগুলিতে আজও যে চিত্র রয়ে গেছে, সেগুলি থেকে আমরা গুপ্তযুগের চিত্রশিল্পীদের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাই।

বিজ্ঞান :—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট এবং বরাহমিহির। আর্যভট্টই সর্বপ্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন। বরাহমিহিরের সূর্য সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থ বিজ্ঞান জগতের এক মহামূল্য সম্পদ। প্রাচীন ভারতে গণিত-শাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। গুপ্তযুগের পূর্বে ভারতীয় গণিত পাটি-গণিত এবং বীজগণিত—এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্যের সাহায্যে সকল অঙ্ক লিখন, দশমিক পদ্ধতি, বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অগ্রগতির কথা ব্যক্ত করে। দিল্লীর নিকট চন্দ্ররাজ নির্মিত লৌহস্তম্ভ ভারতীয় ধাতু-শিল্পের চরম নিদর্শন। পনের শ' বছর পূর্বের তৈরী এই স্তম্ভে আজ পর্যন্তও কোন মরচে ধরে নি। তামা ও ব্রোঞ্জের মূর্তি নির্মাণেও শিল্পীরা দক্ষ ছিলেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত উন্নত ছিল। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন চরক ও সুশ্রুত। মৌর্যযুগ থেকেই ভারতে জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল ও পশু চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। গুপ্তযুগে জীবদেহ কেটে পরীক্ষা করবার রীতি ও মোমের মূর্তির ওপর অস্ত্রোপোচার করে দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হত।

উচ্চ শিক্ষা :—বাল্যকাল থেকে গুরুগৃহে শিক্ষালাভ ছাড়াও প্রাচীন ভারতে উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য ভারতের বিভিন্নস্থানে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে তক্ষশিলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শ্রেষ্ঠ। তক্ষশিলার বিশ্ব-বিদ্যালয়টি অত্যন্ত প্রাচীন। এখানে ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত ধরনের পাঠ্যক্রম চালু ছিল। অর্থশাস্ত্র প্রণেতা চাণক্য বা কৌটিল্য,

ব্যাকরণ-রচয়িতা পাণিনি এবং বিখ্যাত চিকিৎসক চরক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল গুপ্তযুগে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নের জন্য দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র আসত।

প্রাচীন পৃথিবীর কোন সভ্যতাই একক বা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে গড়ে ওঠেনি। সব সভ্যতাই একে অপরের সংস্পর্শে এসেছে। প্রত্যেক সভ্যতাই অপরকে কিছু দান করেছে আবার অপরের কাছ থেকে কিছু গ্রহণও করেছে। এই দান-প্রতিদানের মধ্য দিয়েই সব সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিবর্তনের স্তরে স্তরে ইতিহাসের এই পরম সত্যের সন্ধান মেলে।

অনুশীলনী

১। (ক) আর্য নামটি কিভাবে এল? ভারতে আর্যরা কোন্ পথে এসেছিল? তারা কিসের জন্য অতি সহজে স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করে?

(খ) আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি? এটি ক'টি এবং কি কি ভাগে বিভক্ত ছিল?

(গ) ভারতীয় আর্যদের ইতিহাসের প্রধান উৎস কি? বৈদিক যুগে সমাজ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? প্রথম অবস্থায় আর্যদের ধর্মের রূপ কি ছিল?

(ঘ) আর্য সমাজে কিভাবে জাতিভেদ প্রথার প্রতিষ্ঠা হয়? আর্যদের জীবন কয়টি আশ্রমে বিভক্ত ছিল? আশ্রমগুলির নাম কি?

(ঙ) প্রাচীন ভারতে দু'টি মহাকাব্যের নাম কি? এই দু'টি মহাকাব্য থেকে আর্যসভ্যতা সম্বন্ধে কি সব তথ্য জানা যায়?

(চ) জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব কেন হল? জৈনধর্ম কে প্রচার করেন? তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(ছ) বুদ্ধদেবের ছোটবেলার নাম কি ছিল? তাঁর বুদ্ধ নাম কেন হল? বুদ্ধদেবের ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(জ) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তিনি কোন্ বিদেশী সেনাপতির সাথে যুদ্ধ করেছিলেন? যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? তাঁর সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

(ঝ) অশোক যুদ্ধ করে কোন্ দেশ জয় করেন ? ঐ যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ? যুদ্ধের ফলে অশোকের জীবনে কি পরিবর্তন আসে ?

(ঞ) শ্রেষ্ঠ গুপ্তসম্রাটের নাম কি ? তাঁর রাজ্য জয়ের বর্ণনা দাও।

(ট) কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ? তাঁর রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ? দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত কোন্ কোন্ বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করেন ?

(ঠ) প্রাচীন বাংলার কয়েকটি জনপদের নাম কর। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে কি জানা যায় ?

(ড) মেগাস্থিনিস এবং ফা-হিয়েন কোন্ কোন্ ভারতীয় সম্রাটের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন ? তাঁরা কোন্ দেশ থেকে এসেছিলেন ? তাঁরা ভারতের সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে কি লিখেছেন ?

(ঢ) কি ভাবে ভারতের সাথে বিদেশের যোগাযোগ ঘটে ? মধ্য এশিয়ায় ভারতের সংযোগ কি ভাবে ঘটেছিল ? এর ফল কি হয়েছিল ?

(ণ) প্রাচীন ভারতে কোন্ ভাষায় বিখ্যাত সাহিত্য রচিত হয় ? প্রাচীন ভারতের একজন বিখ্যাত কবি,একজন নাট্যকার,একজন জ্যোতির্বিদ এবং একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর নাম কর।

(ত) প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। অজন্তা কি জন্য বিখ্যাত ?

২। ডানদিকের সারি থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

(ক) আর্যদের সবচেয়ে প্রাচীন বেদ	সামবেদ, অথর্ব বেদ, ঋক্‌বেদ।
(খ) যমের নিকট থেকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন	নচিকেতা, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য।
(গ) বুদ্ধদেবের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন	চন্দ্রগুপ্ত, আনন্দ, বিন্দুসার।
(ঘ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল	কণৌজে, পাটলিপুত্রে, সিংহলে।
(ঙ) শকুন্তলা নাটকের রচয়িতা	ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস।
(চ) আর্যভট্ট ছিলেন একজন	রাজনীতিবিদ, অস্ত্রবিদ,জ্যোতির্বিদ।
(ছ) অজন্তার গিরিগুহাগুলি নির্মিত হয়	হিন্দু সন্ন্যাসীদের বাসের জন্য, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসের জন্য।
(জ) সূর্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থের রচয়িতা	চাণক্য, কালিদাস, বরাহমিহির।